বেদ ও স্বামী দয়ানন্দ

বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্ ❁ সর্ব জ্ঞানময়ো হি সঃ ❁ বেদোনিত্যমধীয়তাম্

বেদোদ্ধারক স্বামী দয়ানন্দ

লেখক—অধ্যাপক উমাকান্ত উপাধ্যায়

আচার্য্য

আর্য সমাজ কোলকাতা

অনুবাদক প. বাসুদেব শাস্ত্রী

ওঁম্

বেদ ও স্বামী দয়ানন্দ

লেখক

অধ্যাপক উমাকান্ত উপাধ্যায়

অনুবাদক

প. বাসুদেব শাস্ত্রী

প্রকাশক

আর্য্য সমাজ কোলকাতা

১৯নং বিধান সরণী

বেদ এবং স্বামী দয়ানন্দ

প্রফেসর উমাকান্ত উপাধ্যায়

—ঃ ভূমিকা ঃ—

ভারতের ঋষি-মুনিরা, মনিষীরা এবং বিদ্বানেরা বেদের মহত্ত্বকে একস্বরে স্বীকার করেছেন—

- **বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্**—বেদ হল সব ধর্মের মূল (মনু ২।৬)
- **ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ**—ধর্ম জানার জন্য বেদ হল পরম প্রমাণ। (মনু ২।১৩)
- **শ্রুতিস্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী**—শ্রুতি এবং স্মৃতির মধ্যে যদি বিরোধ হয় তখন বেদই হবে মান্য। (জাবাল)
- **কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি**—কর্ম করার জ্ঞান বেদ থেকেই প্রাপ্ত হয় (গীতা ৩।১৫)

বেদের এত মহিমা হওয়ার পরেও মধ্যকালে, পুরাণকালে বেদের অধ্যয়ন—অধ্যাপনা উপেক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু সামান্য প্রয়াস আচার্য্য সায়ণ করেছেন তা স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের পুষ্টির জন্য হয়েছে, বেদের যথার্থ অর্থের প্রকাশ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের পর প্রায় একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ইত্যাদি নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলির প্রচার-পাঠ-কথা আদিতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল, ঐসবেরই প্রচার হতে লাগলো, ওদেরই যুগ এসে গেল এবং বেদ উপেক্ষিত হয়ে গেল।

প্রভুর কৃপাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আবির্ভাব হল এবং উনি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আর্য্য সমাজের স্থাপনা করলেন। বহুমুখী কার্যক্রম শুরু হল। শিক্ষা প্রচার, স্বদেশী প্রচার, সামাজিক কুরীতির সংস্কার ইত্যাদি তীব্র বেগে চলতে লাগল। কিন্তু মুখ্য কার্য্য বেদের প্রচারই রয়ে গেল। স্বামীজী বেদের উপর অত্যন্ত প্রশংসনীয় কার্য্য করেছেন তাই বেদের তীব্র প্রচার হতে লাগল। স্বামীজী বেদের ভাষ্যও করেছেন। (যজুর্বেদ সম্পূর্ণ এবং ঋগ্বেদের সপ্তম মন্ডলের উপর আংশিক) স্বামীজীকে বিরোধীরা বিষপান করিয়ে মেরে ফেললেন এবং বেদভাষ্যের মহত্ত্বপূর্ণ কার্য্য অপূর্ণ থেকে গেল।

স্বামীজীর সংস্কারকার্য্যে বিক্ষুব্ধ লোকেরা স্বামীজীর সর্বাত্মনা বিরোধ করেছে। আজ স্থিতি পরিবর্তন হয়েছে। সনাতনী পৌরাণিকেরাও এখন তত বেশী উগ্র বিরোধী নয়। স্বামী দয়ানন্দজীর বেদের সম্বন্ধে কি বক্তব্য এবং আচার্য সায়ণ আদি ভারতীয় বিদ্বান তথা মোক্ষমূলর ইত্যাদি পাশ্চাত্য বিদ্বানদের থেকে কতটা মতভেদ রয়েছে, এর পরিচয়াত্মক জ্ঞান হতে পারে —এইজন্যই এই বই লেখা। একপ্রকার বলতে গেলে এটি বিভিন্ন দিক দিয়ে সামান্য ধরণের, সর্বসাধারণের বোঝার জন্য যোগ্য প্রয়াস। সুহৃদয় পাঠকবর্গকে বেদের সম্বন্ধে প্রারম্ভিক পরিচয় প্রাপ্ত হতে পারে—এমনি আশা করি—

পুস্তকের সুন্দর প্রকাশনের জন্য সাধনা প্রেসের শ্রীঅজিত চৌধুরী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই।

আর্যসমাজ স্থাপনা দিবস — বেদের সেবক
চৈত্রশুক্ল ১, সম্বৎ ২০৬২ — উমাকান্ত উপাধ্যায়
তাং—৯/৪/২০০৫

সূচীপত্র

স্বামী দয়ানন্দ : জীবন পরিচয়

ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দী হল নবজাগরণের কাল। এই কালে উচ্চ থেকে উচ্চ, মহান থেকে মহান অনেক মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দের ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব, দেশ-ধর্মসেবা, বেদোদ্ধার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পৃথক স্থান রয়েছে। মহান যোগী অরবিন্দ ঘোষ বলেছিলেন —"সমস্ত মহাপুরুষ পর্বতশিখরের মতো নিজের প্রকাশ, নিজের আভা, নিজের সুন্দরতা পৃথক-পৃথক রূপে প্রকট করে থাকেন। সবই একে অন্যের থেকে ভিন্ন, মনোরম, দর্শনীয় প্রতীত হয়। কিন্তু এই সমস্ত উত্তুঙ্গশৃঙ্গগুলির মধ্যে সবচেয়ে উন্নত, গৌরীশংকরের সমান, অপ্রতিম, অদ্ভুত, অপূর্ব, মহর্ষি দয়ানন্দের বহুআয়াসী, বহুবিধ ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন হল অদ্ভুত, বিচিত্র, অদ্বিতীয়, ব্রহ্মচর্য্যে উদ্দীপ্ত, তপস্যার বলে কুন্দন, আর্যজ্ঞানে প্রাঞ্জল, স্বর্ণাভিরাম এবং বর্ণনাতীত।

জন্ম এবং শৈশব

স্বামী দয়ানন্দের জন্ম ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষ ১০, ১৮৮১ বিক্রম তদনুসার ১২ ফেব্রুয়ারী ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে মৌরভী, টংকারা, সৌরাষ্ট্র, গুজরাটে হয়েছিল। পিতার নাম ছিল কর্ষণজী তিওয়ারী। তিনি ঔদীচ্যকুলের সামবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি উচ্চকোটির প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কর্ষণজী সরকারের রেভিনিউ কালেক্টর, ধনীমানী, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পদের ভিত্তিতে সরকার তাঁকে সুরক্ষা সহযোগের জন্য তাঁর অধীনে সিপাই এবং কেরানী (লিপিক) নিযুক্ত করে রেখেছিল।

কর্ষণজী শ্রদ্ধালু কট্টর শিবভক্ত ছিলেন। তিনি নিজের পুত্রের নাম ভক্তভাবের বশীভূত হয়ে মূলশংকর রেখেছিলেন। সুতরাং স্বামী দয়ানন্দের পিতৃ-প্রদত্ত নাম মূলশঙ্কর ছিল। সমস্ত সাংসারিক সুবিধা মূলশংকরে উপলব্ধ ছিল।

কর্ষণজী উচ্চকুলীন ব্রাহ্মণ মর্যাদা অনুসারে মূলশংকরের উপনয়ন-বেদারম্ভ সংস্কার আট বছরেই করে দিয়েছিলেন। শাস্ত্রের আদেশ হল—

"অষ্টমে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ"। পিতার আদেশে মূলশংকর ব্রাহ্মণের দ্বারা করণীয় সমস্ত ধার্মিক কৃত্য করার অধিকারী হয়ে গিয়েছিল।

পিতা নিষ্ঠাবান শ্রদ্ধাবান শৈব ছিলেন। মূলশংকর বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ করা প্রারম্ভ করল। যদ্যপি তাঁরা জন্মানুসার সামবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু শৈবনিষ্ঠার কারণে মূলশংকর যজুর্বেদে বর্ণিত "রুদ্রাধ্যায়ী"-কে প্রথম কণ্ঠস্থ করল। মূলশংকর ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ যজুর্বেদ কণ্ঠস্থ করল। কিছু কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণও পড়ল। ভূতভাবন ভূতেশ মহাদেবকে মহিমামণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে কর্ষণজী নিজের পুত্র মূলশংকরকে শিবের পৌরাণিক গাথাও পড়িয়ে রেখেছিলেন। এই কাজের অভীষ্ট ফল পাওয়া গেল। মূলশংকরের শ্রদ্ধা ভগবান শিবশংকরের প্রতি বাড়তে লাগল। শিশু কুমার নির্মল চিত্তে শিবের মহিমা ছড়িয়ে পড়ল। শিবের মহিমা কিশোর বালককে অভিভূত করে ফেলল। মূলশংকরও পিতার চরণচিহ্নে চলতে চলতে কট্টর নিষ্ঠাবান শিবভক্ত হয়ে উঠল।

শিবরাত্রি ব্রত : শাশ্বত জাগরণ

মূলশংকরের বয়স যখন ১৩ বছর হল তখন শ্রদ্ধালুপিতা কর্ষণজী পুত্র মূলশংকরকে শিবরাত্রিতে ব্রত রাখার প্রস্তাব দিলেন। শিবরাত্রির ব্রত রাখার বিহিত কার্য্য হল ২৪ ঘন্টার উপবাস, সম্পূর্ণ রাত্রি জাগরণ, রাত্রির চার প্রহরের প্রত্যেক প্রহরে শিবের পূজা। কিশোর বয়সের পুত্র, ২৪ ঘন্টার ব্রত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সম্পূর্ণ রাত্রি জাগরণ—এই ভেবে মমতাময়ী মায়ের হৃদয় বিচলিত হয়ে উঠল, তিনি মূলশংকরকে দিয়ে ব্রত রাখায় অসহমতি প্রকট করলেন। কিন্তু কট্টরপিতা নিজের নিশ্চয় থেকে একটুও পৃথক হলেন না। মূলশংকরও শিবের মহিমাতে পিতার দ্বারা পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাভাবে ভাবিত ছিল। ফলতঃ ১৩ বছরের মূলশংকর শিবরাত্রির কঠোর ব্রত করার নিশ্চয় করল। দিনের ব্রত উল্লাসময় পরিবেশে কেটে গেল। সন্ধ্যা হল। শিবরাত্রির সমস্ত ব্রতীগণ পূজাসামগ্রী নিয়ে গ্রামের বাইরে স্থিত শিবমন্দিরে পূজা করার জন্য চলে গেল। মন্দিরে পূর্ণ উল্লাস, খুশীর বাতাবরণ, কেউ মন্ত্রপাঠ করছে, কোথাও স্তোত্রপাঠ হচ্ছে, কোথাও ঘন্টা বাজছে, কোথাও শঙ্খধ্বনি, সবাই নিজের ব্রতে উল্লসিত হয়ে চলছে। প্রথম প্রহরের পূজা অতি শ্রদ্ধাভক্তিতে, ভজন কীর্ত্তন, পূজাপাঠে পূর্ণ হল। দ্বিতীয় প্রহরের পূজাও সমাপ্ত হল। রাত গভীর

হতে চলল। সারাদিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ব্রত রাখার উল্লাসজনিত ক্লান্তি, নিদ্রাদেবীর মোহিনীমায়া, ব্রতীগণের ভক্তি-ভাষিত ভাবনা নিদ্রায় ভার মনে হতে লাগল। এক-এক করে ব্রতীগণ, ভক্তগণ, পূজারী সবাই শুয়ে পড়ল। মূলশংকরের পিতাজীও নিদ্রার বশে এসে গেলেন। রাত্রির নীরবতা, তৃতীয় প্রহর, ফাল্গুন মাসের সুখদ শীতল সমীরণ, সবাই শুয়ে পড়লেন। কিন্তু মূলশংকর ছিল ব্রতের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে জেগে রইল। মন্দিরের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত, নিষ্কম্প শিখা, মূলশংকরের ভক্তিভাবিত প্রজ্ঞা-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত নিষ্কম্প, দুই প্রদীপ, পূর্ণ আভাতে প্রদীপ্ত—

বিভাবরী ভাবিত পূর্ণ নীরবে,
পূর্ণে নিশীথে ননু শৈব মন্দিরে।
দ্বৌ দীপকৌ তত্র বিরেজতুঃ প্রিয়ৌ,
প্রিয়ঃ প্রদীপঃ প্রিয় মূলশংকরঃ॥

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী"

সমস্ত প্রাণী নিদ্রা নিমগ্ন—শুয়ে রয়েছে। ব্রতী সংযমী মূলশংকর সজাগ সাবধান নির্বিঘ্ন ব্রতপূর্তিতে দত্তচিত্ত পরিপূর্ণতায়েত চৈতন্য ছিল। এতে নীরবতার আভাস পেয়ে কিছু ইদুঁর বাইরে বেরিয়ে এল এবং শংকরের মূর্তির উপর সমর্পিত ফল, অন্ন, মিঠাই ইত্যাদি খেতে লাগলো। শিবলিঙ্গের উপরে ইদুঁর উঠছে-নামছে, যাচ্ছে, এঁঠো ফেলছে। ভক্ত মূলশংকরের শ্রদ্ধা-আস্থা-নিষ্ঠা দোদুল্যমান হয়ে উঠলো। এই মূর্তিই কি হল ভূতভাবন, পিনাকপাণি, ত্রিশূলধারী রুদ্র শিবের? প্রশ্নের উপর প্রশ্ন—এই কি শিব? একে ক্ষুদ্র মূষক অপবিত্র করছে, অপমানিত করছে—এ আশুতোষ শিবশংকর হতে পারে না। না এই পূজা, ব্রত, ভক্তি শিবের জন্য হতে পারে। অনাস্থা, অশ্রদ্ধা বাড়তে লাগলো। পিতাজীকে জাগালো, নিজের শঙ্কা-অনাস্থা বলল। পিতাজী বোঝালেন—এ শংকর নয়, শংকরের বিগ্রহ, মূর্তি। মূলশংকরের অন্ধকার ছিন্ন হতে লাগলো। মূর্তির উপর থেকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আস্থা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মূর্তিপূজা ব্যর্থ, শিবরাত্রির ব্রত ব্যর্থ। পিতাজীর কাছ থেকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি চাইল। পিতাজী ঘরে যাওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ব্রত না ভাঙ্গার আদেশও দিলেন। মূলশংকর ঘরে এলো, ক্ষুধা লেগেছে, মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খেল। ব্রতভঙ্গ হয়ে গেল। পিতাজী রুষ্ট হলেন। কিন্তু মূলশংকর সত্যের আভাস পেয়ে গিয়েছিল। এই অসত্যের

ত্যাগ এবং সত্যকে অঙ্গীকার করে নেওয়া তার সম্পূর্ণ জীবনের সঙ্গী হয়েছিল। "অসতো মা সদ্‌গময়—তমসো মা জ্যোতির্গময়"—এই সত্যের শাশ্বত সূত্রই তো ছিল, এই অসত্য থেকে সত্যকে স্বীকার করাটাই ছিল যা মূলশংকরকে মহর্ষি দয়ানন্দে পরিনত করল—ঊনবিংশ শতাব্দীর মহান ঋষি, সংস্কারক, ধর্মোদ্ধারক তৈরি করে দিল।

মৃত্যু থেকে পরিচয় : অমরত্বের খোঁজ

কোনো একদিন সঙ্গীত-সন্ধ্যার কার্য্যক্রমে মূলশংকর তাঁর পিতার সাথে কোথাও গিয়েছিল। সঙ্গীত, বাদ্য এবং ভজনের রসাস্বাদন করছিল তখন বাড়ি থেকে কোনো সেবক সংবাদ নিয়ে এল যে মূলশংকরের ছোটো বোনের কলেরা রোগ হয়েছে। রোগ অসাধ্য ছিল। বোনের মৃত্যু হয়। সকলেই কাঁদছিল। সবাই করুণ ক্রন্দন বিলাপ করে চলেছিল। মূলশংকর স্তব্ধ, হতপ্রভ। কি হয়েছে? বোন কোথায় গেছে? মূলশংকর সর্বত্র খুঁজে চলছে—শ্মশানেও। বোনের শাশ্বত বিয়োগ। মৃত্যুর অর্থ বুঝতে পারার মাঝে কিছু দিনের মধ্যে মমতার মূর্তি কাকারও মৃত্যু হয়। এবার মূলশংকর অনেক কাঁদল। মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায়, অমরত্বের খোঁজ। চিরন্তন প্রার্থনা জেগে উঠলো —"**মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়**"—হে প্রভো! মৃত্যু থেকে অমর প্রাপ্ত করাও।

গৃহত্যাগ

মূলশংকরের মন সাংসারিক কার্য থেকে বিরত হতে লাগলো। সে সংসার ত্যাগ করে অমরত্বের মার্গ ধরতে চাইলো। সে পড়াশুনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো। পিতাজীর মনে সন্দেহ উৎপন্ন হল। তিনি গ্রামের পাশেই একজন বিদ্বানের কাছে সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। কোনো একদিন কথায় কথায় মূলশংকর গৃহত্যাগের বিচার গুরুজীকে বলে দিল। গুরুজী বৈষয়িক দিক দিয়ে হিতৈষী ছিলেন। তিনি কর্ষণজীকে পুত্রের বৈরাগ্যভাব অবগত করালেন। মাতা-পিতার চিন্তা হওয়াটা স্বাভাবিক। বৈরাগ্য পরিত্যাগের সুচিন্তিত সূত্র হল—"বিবাহ বন্ধন।" অতএব মূলশংকরের বিবাহের প্রস্তুতি শুরু হল। কন্যার নির্বাচনও সম্পন্ন হয়ে গেল। বিবাহের প্রস্তুতি চলছিল, এর মধ্যে একদিন সুযোগ পেয়ে মূলশংকর নিরবতার সঙ্গে গৃহত্যাগ করল। এটি হল ১৯০৮ বিক্রমাব্দের ঘটনা।

এইসময় মূলশংকরের বয়স ছিল ২২ বছর। এই ভরা যৌবনে চিরকালের জন্য সহজ কৃপাময় পিতার ছায়া, মমতাময়ী মায়ের আঁচল, সম্পন্ন পরিবারের সুখ-সুবিধা, সব কিছু ত্যাগ করে বৈরাগ্যের কন্টকাকীর্ণ মার্গে চলতে লাগলেন। মার্গে এক ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষা নিলেন। নাম হল 'ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য'। কাষায় বস্ত্র, হাতে কমণ্ডুল সম্পন্নতার সমস্ত সুখসুবিধা ত্যাগ হল—অমরত্বের খোঁজ প্রারম্ভ হল। রাস্তায় শুদ্ধচৈতন্য সাধুদের কাছ থেকে সন্ধান পেলেন যে সিদ্ধপুরে বড় মেলা হচ্ছে। সেখানে বড় বড় যোগী, সাধু-সন্ত-মহাত্মা আসবেন, তাঁদের কাছ থেকে অভীষ্ট সিদ্ধি, অমরত্বের মার্গের দীক্ষা পাওয়া যেতে পারে। শুদ্ধচৈতন্য সিদ্ধপুর মেলার দিকে অগ্রসর হলেন। রাস্তায়ে একজন পরিচিত সাধুর সাথে দেখা হয়েছিল। অন্যদিকে বাড়িতে মূলশংকরের খোঁজ চলছিল। সাধু তাঁর পিতা কর্ষণজীকে সমাচার দিল যে তাঁর পুত্র ব্রহ্মচারীবেশে সিদ্ধপুরের মেলায় গিয়েছে। পিতাশ্রী কিছু সিপাহীকে সাথে নিয়ে পুত্রের খোঁজে শীঘ্রই সিদ্ধপুরের দিকে প্রস্থান করলেন। সেখানে পুত্রকে কাষায় বস্ত্র, হাতে কমণ্ডুল ইত্যাদি দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। পুত্রকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করলেন, কাপড় ছিঁড়ে দিলেন। নূতন রেশমী কাপড় পরার জন্য দিলেন। শুদ্ধচৈতন্যও উপরে-উপরে অনুতাপ দেখালেন। ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। পিতাশ্রী সিপাহীদের শক্ত পাহারা লাগিয়ে দিলেন। একদিন রাতে যখন রক্ষক সিপাহী নিদ্রামগ্ন, তখন শুদ্ধচৈতন্য শৌচ যাওয়ার আগ্রহ দেখিয়ে হাতে ঘটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এবারের গেলেন তো গেলেন, শেষবার পিতাজীর পাহারা থেকে স্বতন্ত্র হলেন তো আর কখনও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এলেন না।

সন্ন্যাস এবং যোগ সাধনা

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষাতে শুদ্ধচৈতন্যের ঝঞ্ঝাট ছিল নিজ হাতে ভোজন তৈরি করা। তিনি এক দাক্ষিণাত্য দণ্ডী সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা নিলেন এবং স্বামী পূর্ণানন্দ তাঁর নাম দিলেন 'স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।' এমন সুন্দর সংযোগ তৈরি হল যে দুইজন উচ্চকোটি যোগীর সান্নিধ্য পেলেন। উক্ত যোগী সন্ন্যাসীদ্বয়ের নাম ছিল—স্বামী জ্বালানন্দ পুরী এবং স্বামী শিবানন্দ গিরি। এই দুই কৃপাময় সন্ন্যাসী তাঁর কৃপাকে কৃতজ্ঞতাপূর্বক স্মরণ করতেন। এসব ১৯১২ বিক্রমাব্দ (১৮৫৫

খ্রিস্টাব্দ) পর্য্যন্ত কালের ঘটনা। এইসময় স্বামী দয়ানন্দ ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেছিলেন।

উত্তরাখন্ড এবং নর্মদা-স্রোত যাত্রা

বিক্রমাব্দ ১৯১২তে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা লেগেছিল। হরিদ্বার থেকে স্বামীজী উত্তরাখন্ডের যাত্রা আরম্ভ করলেন। যখন তিনি ওখী মঠে গেলেন তখন মঠের মহন্ত রাওলজী তাঁর উপর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। রাওলজী স্বামী দয়ানন্দকে তাঁর উত্তরাধিকারী করার প্রস্তাব দিলেন, মঠের সম্পত্তির লোভও দিলেন। কিন্তু দয়ানন্দের জীবনের উদ্দেশ্য তো ছিল অমরত্বের উপলব্ধি। ধনসম্পত্তি তো তাঁর পিতার কাছে প্রচুর ছিল। স্বামীজী রাওলজীর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তো যোগী, সিদ্ধ মহাত্মালোকেদের সন্ধানে হিমাচ্ছাদিত পর্বত শিখরে নগ্ন পায়ে স্বল্প বস্ত্রে দিনরাত এক করে চলেছিলেন। বদ্রীনারায়ণ থেকে অলখানন্দার মতো হিমময়ী পর্বতীয় নদীর স্রোতের দিকে এগিয়ে চললেন। এক জায়গায় বরফের সূঁচালো খন্ডে পদদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল, মূর্চ্ছার মতো অবস্থা, কায়োৎসর্গের মত মানসিকতা, ভাবনা, কিন্তু আবার মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, তা মনের মধ্যে জেগে উঠল এবং উনি কর্তব্যপথে আরূঢ় হয়ে গেলেন।

সন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯১৩ বিক্রমাব্দে স্বামী দয়ানন্দ উত্তরাখন্ড থেকে নীচে নেমে এসে দেশ-দর্শন করতে, সাধু-সন্তদের সঙ্গলাভ করতে করতে নর্মদা স্রোতের যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়লেন। বন্য প্রদেশ, কন্টকাকীর্ণ মার্গ, ভালুকআদি পশুদের সম্মুখীন হয়ে, নরবলি থেকে বেঁচে গেলেন। কিন্তু দেশ দর্শনের অতিরিক্ত অন্য কোনো উপলব্ধি প্রাপ্ত করতে পারলেন না।

রহস্যময় চারটি বছর

নর্মদা স্রোতের যাত্রার বর্ণনা তো স্বামীজী তাঁর আত্মকথাতে স্বয়ং করেছেন। তারপরে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মথুরাতে গুরু বিরজানন্দের চরণে অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হন। স্বামী বিরজানন্দের ঠিকানা, তাঁর বিদ্যাসম্বন্ধী সূচনা তো স্বামী দয়ানন্দজীর কুম্ভযাত্রাতে ১১০ বর্ষীয় স্বামী পূর্ণানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি গুরুদেবের চরণে ৪ বছর পরে উপস্থিত হন। একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন হল যে এই চারবছরে অথবা তিন বছরে স্বামীজী

কোথায় ছিলেন? কি করতেন? এই সময়টাই তো হল প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম স্বাধীন সংগ্রাম এবং স্বামী দয়ানন্দ

স্বামী দয়ানন্দ তাঁর জীবনের কিছু ঘটনাকে সংক্ষেপে বলেছেন। তাঁতে রহস্যাত্মক রূপে উক্ত কালখন্ডের বিষয়ে চুপ থেকে গেছেন। কোলকাতা প্রবাসের সময় উনি একান্তে কিছু লিখেছিলেন সেটা পরে অজ্ঞাতজীবনীরূপে প্রকাশিত হয়।

এই থেকে এবং স্বামী দয়ানন্দের সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়া অন্তঃসাক্ষীর আধারে বিদ্বানন্দের মত হল যে স্বামী দয়ানন্দ সন ১৮৫৭-র প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্ন্যাসীরূপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বামী দয়ানন্দের জীবনীর অনেক প্রতিষ্ঠিত অধিকারী বিদ্বান মানেন যে স্বামী দয়ানন্দ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়রূপে সম্মিলিত হয়েছিলেন।

স্বামী বিরজানন্দের চরণে

সম্বৎ ১৯১৭ বি. ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ গুরু বিরজানন্দের কাছে মথুরাতে অধ্যয়নার্থ উপস্থিত হলেন। গুরুজী সন্ন্যাসীদের কম পড়াতেন কেননা সন্ন্যাসীদের ভোজনাদির ব্যবস্থার সমস্যা ছিল। যখন স্বামী দয়ানন্দ তাঁর নিজের ব্যবস্থা করে নিলেন তখন গুরুদেব ব্যাকরণ মহাভাষ্য সমেত পড়ালেন। গুরু চরণে অধ্যয়ন করতে করতে দয়ানন্দ আর্যজ্ঞানের উপলব্ধি করলেন। গুরুজী দয়ানন্দকে মনুষ্যকৃত এবং ঋষিকৃত গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য বোঝালেন। ঋষিরা হলেন নির্ভ্রান্ত। দয়ানন্দ যাবজ্জীবন আর্যগ্রন্থের প্রচার করে চলেছিলেন। মনুষ্যকৃত গ্রন্থগুলির থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ করে চলেছিলেন। স্বামী দয়ানন্দের স্মৃতি, বুদ্ধি, তর্কশক্তি অত্যন্ত প্রচণ্ড ছিল। গুরু বিরজানন্দ তাঁর প্রতি, তাঁর মেধার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন থাকতেন। উনি দয়ানন্দকে 'কালজিহ্বু' এবং 'কুলঙ্কর' বলতেন। প্রতিপক্ষী স্বামী দয়ানন্দের তর্কের সামনে কখনও টিকতে পারতো না। তাঁর জিভে প্রতিপক্ষীদের জন্য কাল অন্তঃপ্রবেশ করেছিল। পাণিনীয় ব্যাকরণ মহাভাষ্য সমেত সংস্কৃত ব্যাকরণের চূড়ান্ত জ্ঞানের দুর্লভ উপলব্ধির সাথেই গুরু বিরজানন্দ স্বামী দয়ানন্দকে সেই দুর্লভ প্রজ্ঞাও প্রদান করলেন যার দ্বারা স্বামী দয়ানন্দ আর্য

জ্ঞান এবং অনার্য জ্ঞান, ঋষিকৃত গ্রন্থ এবং মনুষ্যকৃত গ্রন্থের মধ্যে বিভেদ করার সামর্থ্য জানতে পারেন। এই জ্ঞান স্বামী দয়ানন্দের জন্য সম্পূর্ণ জীবন অপূর্ব সহায়ক সম্পদা প্রমাণিত হয়ে ছিল। এই আর্যজ্ঞান-অনার্যজ্ঞান বিভেদ ক্ষমতা ঋষি দয়ানন্দকে ঋষিযুগের পরে সারস্বত ভান্ডারে সেই উপলব্ধি প্রদান করল যে ঋষিবিদ্যার সর্বোচ্চ শিখরে বেদজ্ঞানের সূর্য্য সমান আলোকিত হয়ে রয়েছেন। বেদবিদ্যার উপর থেকে হাজার হাজার বছরের ছায়া অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

আদর্শ অপূর্ব গুরুদক্ষিণা

স্বামী দয়ানন্দ গুরু বিরজানন্দের চরণে আড়াই-তিনবছর ছিলেন। যখন দয়ানন্দের বিদ্যা পূর্ণতার নিকটে এল তখন গুরুশিষ্য পরম্পরা অনুসারে স্বামী দয়ানন্দের মনে গুরুদক্ষিণা দিয়ে বিদ্রোহের ভাবনা উৎপন্ন হল। গুরুদক্ষিণাতে সর্বস্বত্যাগী অকিঞ্চন সন্ন্যাসী কি দিতে পারে? গুরু বিরজানন্দ লবঙ্গ খুব ভালবাসতেন। তিনি লবঙ্গ খেতেন। স্বামী দয়ানন্দ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ অল্পখানি লবঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর নিজের আর্থিক অসমর্থতার কথা বলে গুরু দক্ষিণারূপে লবঙ্গ স্বীকার করার প্রার্থনা করলেন। আদর্শ গুরু বিরজানন্দ নিজের দক্ষিণাস্বরূপ বেদ-বিদ্যার প্রচার, ধর্মের নামে প্রচলিত পাখন্ডের অপসারণ, আর্যজ্ঞানের প্রচার চেয়ে বসলেন। স্বামী দয়ানন্দ পরিপূর্ণ সমর্পণভাবে এই দক্ষিণা দেওয়া স্বীকার করে নিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষু গুরু আদিত্য ব্রহ্মচারী শিষ্যের কাছ থেকে যেটুকু দক্ষিণা প্রাপ্ত করলেন—তা তিনকালে সম্পূর্ণ সংসারে অপূর্ব—বেদবিদ্যা এবং আর্যজ্ঞানের পুনরুদ্ধার তথা পাখন্ড থেকে সংসারকে মুক্ত করা। দক্ষিণা সংসারের কল্যাণের জন্য।

কার্য্যক্ষেত্রে জীবনদান

স্বামী দয়ানন্দ সন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বেদের প্রচার এবং পাখন্ড-খন্ডন করার উদ্দেশ্যে কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করলেন। একাকী সন্ন্যাসী, না কোনো সাথী, না সহযোগীকে ভোজন দেবে কে, কে দেবে রাস্তা-খরচ? সব ঈশ্বরের ইচ্ছা। সারা সংসার বিরোধী-সহযোগে এক পরমেশ্বর—

থা সব জগৎবিরোধী, ফিরভী ঋষি দয়ানন্দ,
বৈদিক ধর্ম কা ঝন্ডা, ফহরা গয়া অকেলা।

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সবাই বিরোধী হয়ে গেল। হিন্দুদের জাতীয় স্বাভিমান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুদের ধর্ম, দেবীদেবতা সবাইয়ের অপমান হয়ে চলছিল। খ্রীষ্টান পাদরী হিন্দুদেরকে খ্রীষ্টান তো অন্যদিকে মৌলবী মুসলমান করার জন্য একজোট হয়েছিল। বেদশাস্ত্র, ঋষিমুনি, রামকৃষ্ণ, দেবীদেবতা সবাইয়ের সার্বজনিক আলোচনা হয়ে চলেছিল। স্বামী দয়ানন্দ একদিকে পাখন্ডের খন্ডন করতেন তো অন্যদিকে খ্রীষ্টান মুসলমানদের প্রতি বজ্রকঠোর হয়ে সংঘাত করতেন। ব্যাখ্যান, শাস্ত্রার্থ, বার্তালাপ সবকিছুই চলছিল। ধার্মিক জগতে এক নূতন জাগরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ সমস্ত গাঙ্গেয় প্রদেশগুলিকে আন্দোলিত করে রেখেছিলেন।

কুম্ভে পাখন্ড-খন্ডিনী পতাকা

সম্বৎ ১৮২৩ বি. সন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা লেগেছিল। লক্ষ-লক্ষ নরনারী একত্র হয়েছিল। প্রচারের শুভাবসর জেনে স্বামীজী হরিদ্বারে আস্তানা করলেন এবং তাঁর নিজের কুটীরের সামনে পাখন্ড-খন্ডিনী পতাকা গাড়লেন। নিত্য পাখন্ডের খন্ডন এবং বেদশাস্ত্রের উপদেশ হতে লাগল। দলে দলে বিদ্বান্, সাধু-সন্ত, তীর্থযাত্রী আসতে লাগল। বাদ-বিবাদ, শাস্ত্রার্থ হতে লাগল। স্বামীজী মূর্তিপূজাকে বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধ করতে লাগলেন। কণ্ঠী, মালা, তিলক, রুদ্রাক্ষ, তীর্থস্নান ইত্যাদিকে বেদবিরুদ্ধ এবং পাখন্ড বলতে লাগলেন। ভাগবৎ ইত্যাদি পুরাণ মহর্ষি ব্যাসের লেখা নয়। পুরাণগুলিকে স্বার্থপর পণ্ডিতরা রচনা করেছে এবং পুরাণগুলির মহিমাকে বাড়ানোর জন্য মহর্ষি ব্যাসের নামে তাঁদের প্রসিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্বামী দয়ানন্দের উক্ত মন্তব্যগুলির প্রচারের ফলে পাখন্ডীদের দলে হাহাকার সৃষ্টি হয়ে গেল। ধার্মিক জগতে প্রচন্ড ক্ষোভ ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

স্বামী দয়ানন্দ পাখন্ডীদের খন্ডন তো করতেনই, সাথে সাথে ধার্মিক এবং সামাজিক কুরীতিগুলির সংস্কারের প্রচারও করতেন। বাল্যবিবাহ এবং বৃদ্ধ বিবাহের বিরোধ, নারীশিক্ষার প্রচার, অস্পৃশ্যতার বিরোধ ইত্যাদি সংস্কারমূলক কার্য্যগুলিকেও পূর্ণ মহত্ত্ব দিতেন। যেখানে কোথাও শাস্ত্রার্থ অথবা বাদ-বিবাদ হত, সর্বত্রই কাশীর পন্ডিতদের অজুহাত দেওয়া হত। অনেকবার পন্ডিত লোক বলতেন যে শাস্ত্রার্থ তো কাশীর পন্ডিতবর্গের দ্বারা করানো দরকার। এদিকে আবিন্ধ্য হিমাচল সম্পূর্ণ প্রদেশে সংস্কারের জোয়ার চলছিল। অন্ততঃ স্বামীজী বিদ্যার কেন্দ্র কাশীতে শাস্ত্রার্থ করার দৃঢ়সংকল্প করে নিলেন।

কাশী শাস্ত্রার্থ

কাশী বিশ্বনাথের পুরী, সংস্কৃতবিদ্যার কেন্দ্র, ধার্মিক মান্যতার দুর্গ, কাশী যা স্বীকার করবে সেটাই মান্যতা—ভারতীয় জনমানসে এই মান্যতাকেই স্বীকার করা হয়। স্বামী দয়ানন্দ কাশীতে "মূর্তিপূজা হোল বেদবিরুদ্ধ" —এই বিষয়ের উপর কাশীর পণ্ডিতবর্গের সাথে শাস্ত্রার্থ করার নিশ্চয় করলেন।

এই নিশ্চয় অনুসারে সম্বৎ ১৯২৬ বি. সন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ কাশী পৌঁছলেন। উনি শাস্ত্রার্থের আমন্ত্রণ দিলেন। কাশী নরেশের সংরক্ষণে কাশীর পণ্ডিতমন্ডলী প্রস্তুতি নিল। কাশী নরেশের উপস্থিতিতে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর নেতৃত্বে, পন্ডিতদের ভীড়, হাজারে হাজার গুণ্ডা চিৎকার করতে করতে, গন্ডগোল করতে করতে, তীব্র শব্দ করতে করতে শাস্ত্রার্থ—স্থলে পৌঁছে গেল। শান্তি-সুব্যবস্থার ভার কাশীনগরের মুখ্য পুলিশ অফিসারের উপর ছিল এবং তিনি ভালো বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। কিন্তু বিরোধীরা অব্যবস্থা করার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল।

শাস্ত্রার্থের বিষয়টি এমন ছিল যে মূর্তিপূজার বিষয় সম্বন্ধী মন্ত্র পণ্ডিতদের প্রস্তুত করতে হবে। স্বামী দয়ানন্দের মতো বিদ্বান্, শাস্ত্রার্থে সুদক্ষ, পারঙ্গতের সামনে যখন পণ্ডিতমণ্ডলী কোন মন্ত্রই মূর্তিপূজার সমর্থনে প্রস্তুত করতে পারল না তখন সুচিন্তিত যোজনানুসার স্বামী বিশুদ্ধানন্দ কোনো এক প্রসঙ্গান্তর উপস্থিত করলেন তো স্বামী দয়ানন্দ পূর্বাপর প্রসঙ্গের আকাঙ্ক্ষা করলেন। বিশুদ্ধানন্দ তো এইরকম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ স্বামী দয়ানন্দের উপর কটাক্ষ করে বললেন—"সবকিছু যদি কণ্ঠস্থ নাই তাহলে কাশীতে শাস্ত্রার্থ করতে কেন এসেছেন?" স্বামী দয়ানন্দ প্রচণ্ড শাস্ত্রার্থীদের মতো প্রত্যাক্রমণ করে বললেন—"যদি আপনার সব কিছু মুখস্থ রয়েছে তাহলে ধর্মের লক্ষণ বলুন"। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলতে পারলেন না। ভীষণ লজ্জার কথা। বালশাস্ত্রী বিশুদ্ধানন্দের মান বাঁচানোর জন্য বললেন—"আমার সবকিছু মুখস্থ আছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।" স্বামী দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি অধর্মের লক্ষণ বলুন।" বালশাস্ত্রীও চুপ হয়ে গেলেন। কিছু সময় এদিক সেদিক করতে লাগলেন। কিন্তু মূর্তিপূজার কোনো বিধিসম্মত প্রমাণ বেদমন্ত্রের দ্বারা কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত করতে পারলেন না। সমস্ত নিষ্পক্ষ তটস্থ শ্রোতাগণ ভালোভাবে বুঝে নিয়েছিল যে বেদে মূর্তিপূজার বিধান নাই। কাশীর পণ্ডিতেরা খুব

গন্ডগোল শুরু করলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ দেশের খবরের কাগজে স্বামী দয়ানন্দের বিজয়ের সমাচার প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপরও স্বামীজী অনেকবার কাশী এসেছিলেন এবং মূর্তিপূজার সমর্থনে বেদের প্রমাণ চেয়েছিলেন কিন্তু মূর্তিপূজার সমর্থকেরা কোন বেদমন্ত্র প্রস্তুত করতে পারে নাই।

স্বামী দয়ানন্দ ইতস্ততঃ অজ্ঞান-পাখন্ডের নিবারণ এবং সত্যধর্মের প্রচার করতে লাগলেন। উপদেশ, ব্যাখ্যান, শাস্ত্রার্থের কার্য্য চলতে লাগল। এর মধ্যে প্রয়াগে কুম্ভমেলা শুরু হল। লক্ষ লক্ষ লোকেদের মধ্যে প্রচারের ভালো সুযোগ জেনে স্বামীজী প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলাতে গিয়ে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করে দিলেন। এতদিন পর্যন্ত লোকেরা জেনে নিয়ে ছিল যে কাশীর বিজেতা স্বামী দয়ানন্দ ইনিই। কোলকাতার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মসসমাজী বিদ্বান নেতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কোলকাতাতে বেদ পড়ানোর জন্য পাঠশালা আরম্ভ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে, "আপনি কোলকাতা আসুন, সেখানেই বেদ-পাঠশালার উপর বিচার করা যাবে।" আরও অনেক লোকেদের আগ্রহ ছিল যে "স্বামীজী! আপনি কোলকাতা আসুন"। অতএব, স্বামীজী কোলকাতা যাওয়ার মনস্থ করলেন।

কোলকাতা যাত্রা

স্বামী দয়ানন্দ পূর্ব উত্তরপ্রদেশে প্রচার করতে করতে তথা বিহারেও অনেকত্র প্রচার করতে করতে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা পৌঁছলেন। সেই সময় কোলকাতা ভারতবর্ষের সর্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ নগর ছিল। এটি ছিল ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী। ভারতীয় নবজাগরণের আদিপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের ভূমি ছিল। সমস্ত সংস্কৃতিক, সাহিত্যিক গতিবিধির কেন্দ্র এখানেই ছিল। ইংরাজি, বাংলা এবং হিন্দীর সমাচারপত্র এখান থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল। তাৎকালিক ভারতীয় সমাজের অনেক গণ্যমান্য নেতাগণ এখানেই থাকতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো অনেক অনেক ব্যক্তি এখানেই ছিলেন।

একদিন কেশবচন্দ্র সেনের আমন্ত্রণে স্বামীজীর ব্যাখ্যান হচ্ছিল। স্বামীজী সংস্কৃতেই বলতেন। অতএব সংস্কৃতেই ব্যাখ্যান হচ্ছিল। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ব্যাখ্যানের বাংলা অনুবাদ করে চলেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যানের মিথ্যা ব্যবহার করতে এবং অশুদ্ধ অনুবাদ করতে লাগলেন। এতেই

কেশবচন্দ্র সেন পরামর্শ দিলেন—"স্বামীজী আপনি হিন্দীতে ব্যাখ্যান দিতে আরম্ভ করুন।" স্বামীজী তাঁর এই পরামর্শ স্বীকার করে হিন্দীতে ব্যাখ্যান দেওয়া শুরু করলেন। অতএব, এক অহিন্দীভাষীর পরামর্শে স্বামীজী হিন্দীকে হৃদয়ে স্থান দিলেন। অহিন্দীভাষী প্রদেশে, অহিন্দীভাষীর পরামর্শে এক অহিন্দীভাষী সন্ন্যাসী জনসম্পর্কের জন্য হিন্দীতে বলা আরম্ভ করলেন। এই হিন্দী রাষ্ট্রভাষা, সম্পর্ক ভাষা এ হল তার নিশ্ছল স্বীকৃতি।

কোলকাতা প্রবাস পর্যন্ত স্বামীজী এক কৌপীন মাত্রই ধারণ করতেন। শ্রীকেশবচন্দ্র সেন যুক্তি দিলেন যে আপনি সভা আদিতে যান ; অতএব পুরাবস্ত্র ধারণ করা উচিত। স্বামীজী এই কথারও ঔচিত্যকে স্বীকার করে নিয়ে সারা শরীরে পূর্ণ বস্ত্র ধারণ করতে লাগলেন। এটি হল সত্যকে গ্রহণ করার আদর্শ।

কোলকাতাতে বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনের জন্য পাঠশালার স্থাপনা তো সম্ভব হতে পারল না, কিন্তু কোলকাতার এই যাত্রা অনেক দিক থেকে উপযোগী ছিল। সংগঠিতরূপে প্রচারকার্য্য, ব্যাখ্যান আদি প্রোগ্রামের পূর্ব সূচনা, প্রচার কার্য্যে বিজ্ঞাপন আদির সুনিয়োজিত স্বরূপ—এই যাত্রার পরে দৃষ্টিগোচর হয়। স্বামীজী ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রচার কার্য্যে নেমেছিলেন। সন্ ১৮৭৩ পর্যন্ত পর্যাপ্ত অনুভব হয়ে গিয়েছিল। ব্যবস্থিত লেখনকার্য্য এবং সংগঠিত প্রচার এরপরই তীব্রগতিতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১৬ এপ্রিল ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী কোলকাতা থেকে প্রস্থান করে গেলেন।

আর্য্য সমাজের স্থাপনা

স্বামীজীর প্রচারক্ষেত্র বৃদ্ধি পেতে লাগল, সাথে সাথে প্রভাব ক্ষেত্রও সমভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল। স্বামীজী সন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে গুরু বিরজানন্দের আশীর্বাদ নিয়ে, তাঁরই নির্দেশ-উপদেশানুসার প্রচার কার্য্যে অবতীর্ণ হলেন। সম্পূর্ণ উত্তর ভারতে সংস্কারকার্য্য এবং বেদ প্রচারের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। স্থানে স্থানে ভক্তলোক সংগঠন তৈরি করে প্রচার কার্য্যকে গতি এবং স্থিরতা প্রদান করার জন্য জোর দিচ্ছিল। স্বামী দয়ানন্দ স্বয়ংই এটা অনুভব করেছিলেন যে, সংগঠন তৈরি করে কার্য্য করলে পর অধিক প্রচার কার্য্য সম্ভব হতে পারবে। ফলস্বরূপ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুম্বই নগরে আর্য্য সমাজের স্থাপনা হল। স্বামীজী আর্যসমাজকে পূর্ণতঃ জনতান্ত্রিক সংগঠন তৈরি করলেন। এর

একটি অপূর্ব ঘটনা ছিল। স্বামীজী মঠাধীন, একতন্ত্র, একাধিক ইত্যাদির পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। মন্দির, মসজিদ, চার্চ কোথাও তো জনতন্ত্র ছিল না। ধার্মিক সংগঠনের কথা ছেড়েই দিন, সেই সময় পর্য্যন্ত শাসন ও সরকারে সীমিত, শর্তসাপেক্ষেই জনতন্ত্রের প্রবেশ হয়েছিল। সেই সময় ১৮৭৫-এ আর্য্যসমাজের নিয়ম-উপনিয়ম-উদ্দেশ্য আদি সব একসাথে ছিল। কিছুদিনেই স্বামীজীর সংগঠনাত্মক অনুভব যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল। লাহোর-এ দশ-নিয়ম তথা উপনিয়ম আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। নিয়মগুলিতে সংশোধন-পরিবর্তন ইত্যাদির কোন বিধান রাখা হল না। দেশ-কাল-পরিস্থিতির আকাঙ্ক্ষার অনুসারে উপনিয়মগুলিতে স্বামীজী সংশোধন-পরিবর্তনের প্রাবধান সেই সময় করে দিয়েছিলেন। স্বামীজীর সুস্পষ্ট মান্যতা হল যে সমস্ত নির্ণয় জনতন্ত্রাত্মক রীতিতে বহুমতের ভিত্তিতে নেওয়া হবে। ভারতবর্ষে আর্য্য-সমাজের সদস্যদের জন্য হিন্দীর জ্ঞান আবশ্যক করে দেওয়া হল এবং স্বামীজী এটাও নিশ্চিত করে দিলেন যে আর্য্যসমাজের গতিবিধি, লেখা-পড়া, হিসাব, বিবরণ সবকিছু হিন্দী (আর্য্যভাষা)-তেই রাখা থাকবে। স্বামীজীর এইসব অনুভব, প্রয়োগ, রাষ্ট্রীয় একতার দৃষ্টিতে দূরগামী প্রভাব রাখা প্রমাণিত হয়েছে।

লেখন কার্য্য ঃ স্বামী দয়ানন্দজীর লেখন-কার্য্য কোলকাতা থেকে ফিরে আসার পর বিধিপূর্বক আরম্ভ হয়। সত্যার্থ-প্রকাশের প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫-এ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ রাজা জয়কিশন দাসের ব্যবস্থাতে লেখা হয়েছিল এবং তাঁরই ব্যবস্থাতে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থ মুখে বলে বলে লেখাতেন। সত্যার্থ প্রকাশের এই সংস্করণের লেখকও শ্রীরাজাজী-ই দিয়েছিলেন। এই সংস্করণের লেখন এবং প্রকাশনের ব্যবস্থা অন্যের হাতে থাকার জন্য অনেক মন্তব্য স্বামীজীর মান্যতার বিরুদ্ধে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ সমুল্লাম খ্রীষ্টানমত এবং ইসলাম মতের সমালোচনাতে লেখা হয়েছে। রাজা জয়কিশন সরকারী চাকুরে ছিলেন এবং উনি উক্ত সমুল্লাসদ্বয়কে ছাপলেন না। অনুমান হচ্ছে যে উনি এবং সরকার খ্রীষ্টান—মুসলমানদের কোপভাজন থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। প্রকাশনের পরে স্বামীজীর সহজ বিশ্বসনীয়তাতে আঘাত লাগল। কিন্তু যা ছাপা হয়ে গিয়েছিল তা দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্ণরীতিতে সংশোধিত করে দেওয়া হয়েছিল।

সত্যার্থ-প্রকাশ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

স্বামীজীর জন্মের ভাষা ছিল গুজরাটী। অধ্যয়ন-অধ্যাপন-বার্তালাপ, শাস্ত্রার্থ সবকিছুর ভাষা ছিল সংস্কৃত। ১৮৭৩-এ কোলকাতা প্রবাসের সময় থেকে তিনি হিন্দীতে বলতে থাকেন। সন ১৮৭৪-এ সত্যার্থ প্রকাশ-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিকরূপেই ভাষাতে ত্রুটি থাকা অনিবার্য ছিল। বিষয়বস্তুতেও স্বামীজীর লেখক প্রমাদ করে দিয়েছিল। শেষের দুই সমুল্লাস ছেপেই ছিল না। সমস্ত ত্রুটিকে দূর করে স্বামীজী দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন। যদ্যপি বাজারে বিক্রির জন্য সত্যার্থ প্রকাশ স্বামীজীর দেহান্তের পরে এসেছিল কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ পুস্তকের প্রুফ পড়ে নিয়েছিলেন। এইভাবে এই অপূর্ব গ্রন্থ তাঁর নিজস্ব স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

স্বামী দয়ানন্দের মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা

১। সত্যার্থ প্রকাশ—মানব মন্তব্য এবং কর্তব্যের অদ্ভুত বর্ণনা।
২। ঋগ্‌বেদাদি ভাষ্য-ভূমিকা—বেদ এবং বেদার্থকে বুঝে নেওয়ার সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ।
৩। যজুর্বেদ ভাষ্য—সম্পূর্ণ যজুর্বেদের উপর।
৪। ঋগ্বেদ ভাষ্য—(মণ্ডল ৭, সূক্ত ৬১, মন্ত্র ২ পর্যন্ত)।
৫। সংস্কারবিধি—সমস্ত ১৬ সংস্কারের বিধি এবং ব্যাখ্যার সর্বপ্রথম পুস্তকের প্রকাশন।
৬। পঞ্চ মহাযজ্ঞ বিধি (৭) গোকরুণানিধি, (৮) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর গ্রন্থ—অষ্টাধ্যায়ী ভাষ্য, (৯) বেদাঙ্গপ্রকাশ-১৪ ভাগ, (১০) সংস্কৃত বাক্য প্রবোধ, (১১) আর্য্যোদ্দেশ্য রত্নমালা, (১২) ব্যবহার ভানু, (১৩) আর্যাভিবিনয়।

দিল্লী দরবার

ব্রিটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন ১ম জানুয়ারী ১৮৭৭ সালে দিল্লী দরবারের আয়োজন করেছিলেন। এতে ভারতের সমস্ত রাজা, মহারাজা, নেতা, সমাজ সংস্কারক একত্র হয়েছিলেন। প্রচারের ভাল সুযোগ দেখে এই অবসরে স্বামীজী দিল্লীতে উপস্থিত হলেন। রাজা লোকেরা তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বড় প্রযত্নের পশ্চাৎ কিছু সমাজ সংস্কারক

একত্র হয়েছিলেন। মুন্সী কনৈয়ালাল (পাঞ্জাব), বাবু নবীনচন্দ্র রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন (বাংলা), বাবু হরিশ্চন্দ্র চিন্তামণি (মুম্বই), পণ্ডিত ইন্দ্রমণি (উ.প্র) এবং স্যার সৈয়দ অহমদ খাঁ (মুসলমানদের প্রতিনিধি) একত্র হওয়ার মধ্যে প্রমুখ ছিলেন। স্বামী দয়ানন্দের প্রস্তাব ছিল যে আমরা সব একমত হয়ে সমাজ সংস্কার করি তাহলে দেশের সংস্কার শীঘ্রই হতে পারবে। সবাইয়ের একমত, এক মান্যতার প্রচার হোক এটা সাম্প্রদায়িক লোকেদের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। অতএব স্বামীজীর এই প্রস্তাব ফলপ্রসূ হতে পারল না। সাম্প্রদায়িক মান্যতাগুলি সংস্কার কার্য্যের জন্যও এত বড়ো বুদ্ধিমান লোকেদেরও একমত হওয়াতে বাধক হয়ে গিয়েছিল।

আর্য্যভাষা হিন্দীর প্রচার

স্বামী দয়ানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে দেশের উন্নতি এবং রাষ্ট্রীয় একতার সম্পাদনে এক ভাষার প্রয়োগ এবং প্রচলন হওয়া আবশ্যক। সেই একভাষা হিন্দী-ই (আর্য্যভাষা) হতে পারে। তিনি তাঁর নিজের সর্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশের রচনা হিন্দীতে করলেন। পত্র এবং বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতেও তিনি হিন্দীকে স্থান দিলেন। হিন্দী ছিল বাজারের ভাষা। সামান্য কিছু শৃঙ্গার-রসসিক্ত কবিতা এবং কিছু পৌরাণিক কথার অতিরিক্ত হিন্দীতে কোনো সাহিত্য ছিল না। স্বামীজী সামাজিক, রাজনৈতিক, ধার্মিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, বাদ-প্রতিবাদ, ভাষার বহুমুখী বিধিগুলির দিগদর্শন করলেন। সত্যার্থ প্রকাশে প্রভাবশালী হাস্য-মন্তব্য-বাগ্‌ধারা-লোকোক্তি থেকে গম্ভীর দার্শনিক আধ্যাত্মিক বর্ণনার উপলব্ধি হয়। ধার্মিক সাহিত্য, পঞ্চ মহাযজ্ঞবিধি, সংস্কারবিধি, বেদভাষ্য, পাণিনীয় ব্যাকরণ, সব হিন্দীতে সুলভ্য করে দেওয়া ভাষার দৃষ্টিতে বড় ভারী বিপ্লবের কার্য্য হয়েছিল।

সেই সময় উত্তরপ্রদেশ আদি প্রান্তগুলিতে শাসনকার্য্যের ভাষা, লেখন, রেকর্ড ইত্যাদির জন্য উর্দু ভাষা ছিল। স্বামীজী আন্দোলন করলেন, হস্তাক্ষর করে দাবি রাখলেন এবং হিন্দীর প্রয়োগ আরম্ভ করলেন।

আর্য্যসমাজের উপনিয়ম তো তৈরি করে দিয়েছিলেন যে এই সমাজের সবকার্য্য-হস্তাক্ষর থেকে আরম্ভ করে কার্যপদ্ধতি, হিসাব, বইখাতা সবকিছু হিন্দীভাষা এবং দেবনাগরী লিপিতে যেন করা হয়। এর ফলে হিন্দীতে বড় বল প্রাপ্ত হল। পাঞ্জাবের মতো উর্দুবহুল প্রান্তে হিন্দীর প্রয়োগ আশাতীত ভাবে হতে লাগল।

বৈদিক যন্ত্রালয়

স্বামী দয়ানন্দজী তাঁর নিজের জীবনের অন্তিম ৮-৯ বছরে এত বেশী সাহিত্যের নির্মাণ করেছেন, যা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। সন ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সত্যার্থ প্রকাশের প্রথম সংস্করণ আরম্ভ হয় এবং সন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে দেহান্তের পূর্বে কয়েক হাজার পৃষ্ঠার বিশাল সাহিত্য, কত পত্র-বিজ্ঞাপন লেখা হয়েছে এবং প্রকাশিত হয়েছে। বৈদিক যন্ত্রালয়-র নির্মাণের পূর্বে বাজারের প্রেস-গুলির মাধ্যমে সমস্ত প্রকাশন কার্য্য হয়ে চলেছিল। কম সময়ে কার্য্য হওয়া কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য ছিল। অতএব স্বামীজী নিজস্ব প্রেস লাগানোর মনস্থ করেন। সন্ ১৮৮০-র ফেব্রুয়ারী মাসে বৈদিক যন্ত্রালয় আরম্ভ হল। সেখান থেকে তা কিছুকাল পর্যন্ত এলাহাবাদে চলল এবং অন্ততঃ আজমীরে অন্তিমরূপে স্থায়ী হয়ে গেল। স্বামীজীর সারা সাহিত্য এইখান থেকেই প্রকাশিত হতে লাগল। আজও এই প্রেসে স্বামীজীর সাহিত্যের সাথে অন্যান্য উপযোগী প্রকাশন হয়ে চলছে।

পরোপকারিণী সভার নির্মাণ

স্বামী দয়ানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি না তো কোনো নিজের উত্তরাধিকারী শিষ্য তৈরি করেছেন, না কোনো মঠ আদির নির্মাণ করেছেন। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে বৈদিক যন্ত্রালয় প্রেস, বিনা বিক্রির পুস্তক, স্বামীজীর নিজস্ব পুস্তক এবং বস্ত্র ইত্যাদি ছিল। তাঁর মহান কার্য্য ছিল বেদধর্মের প্রচার, তাঁর বিশাল সাহিত্যের প্রকাশন এবং বিক্রি। তিনি ছিলেন সরস্বতী পন্থের সন্ন্যাসীর শিষ্য। অতএব উত্তরাধিকারের ঝগড়া হতে পারতো। অতঃ তিনি একটি সংস্থা "পরোপকারিণী সভা"-কে নিজের উত্তরাধিকারী করলেন। এই সংস্থার রেজিস্ট্রেশন তাং ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুর (রাজস্থান) মেবাড়ের কোর্টে হয়েছিল। এতে ২৩ সদস্য ছিল। এই হল স্বামীজীর উত্তরাধিকারিণী সভা।

গোকৃষ্যাদি রক্ষিণী সভা

স্বামী দয়ানন্দ এটি ভালোভাবেই নিশ্চয় করে নিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের উন্নতির আধার হল গাভি এবং কৃষি। গোহত্যা বন্ধ করানোর জন্য তিনি পূর্ণরূপে প্রযত্নশীল ছিলেন। স্বামীজী সরকারকে জ্ঞাপন দেওয়ার জন্য লক্ষ-

লক্ষ লোকের হস্তাক্ষর করানোর অভিযান চালিয়ে রেখেছিলেন। তিনি "গোকরুণানিধি" নামক একটি পুস্তক লিখে প্রবল তর্ক দিয়ে প্রমাণিত করলেন যে আর্থিকদৃষ্টিতেও গোবধ অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত। তিনি ১৮৮০-৮১-তে "গোকৃষ্যাদি রক্ষিণী সভা"র সংগঠনেরও প্রস্তাব করেছিলেন।

উদ্যোগ বিদ্যালয়

ইংরেজ রাজ্যের পূর্বে ভারতে গ্রাম্য উদ্যোগের খুব ভালো প্রচার প্রসার ছিল। ইংরেজ শাসনে বিধিপূর্বক গ্রাম্য উদ্যোগগুলিকে নষ্ট করার নীতি চালু হয়ে গেল। গ্রাম্য উদ্যোগ নষ্ট হওয়ার ফলে নির্ধনতা এবং বেকারী অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে স্বামীজীর চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। উদ্যোগগুলির উদ্ধার করার জন্য তাঁর মনে দৃঢ় বিচার উৎপন্ন হল। উনি জার্মানির প্রিন্সিপাল বীস মহাশয়ের সাথে পত্রাচার করলেন। স্বামীজী তাঁর সহায়তায় ভারতীয় বিদ্যার্থীদেরকে উদ্যোগের শিক্ষা দেওয়ানো চেয়েছিলেন তথা ভারতবর্ষে উদ্যোগ বিদ্যালয়ের স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু স্বামীজীর দেহাবসানের কারণ উক্ত কার্য্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

দেশী রাজাদের জাগানো

স্বামীজী দৃঢ় রাষ্ট্রবাদী এবং স্বদেশভক্ত ছিলেন। দেশে পরাধীনতার স্থিতি তাঁর কাছে চিন্তার বিষয় ছিল। তিনি সর্বত্র নিজের প্রার্থনাতে, বইগুলিতে, বেদমন্ত্রের ভাষ্যে সর্বত্র সার্বভৌম চক্রবর্ত্তী রাজ্যের কথাবার্তা করতেন এবং স্বরাজ্যের জন্য সচেষ্ট থাকতেন এবং পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন যে দেশে স্বরাজ্য স্থাপিত হোক।

এই উদ্দেশ্যে স্বামীজী দেশীয় রাজাদের মধ্যে স্বধর্ম, স্বদেশ, স্বরাজ্য, সুশাসনের ভাবনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। ওদিকে রাজস্থানের রাজারা উপদেশ শোনার জন্য স্বামীজীকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। অতএব, জীবনের অন্তিমবর্ষগুলিতে তাঁর অধিক সময় রাজস্থানের রাজাদের জাগ্রত করার পেছনে লেগেছিল। তিনি রাজাদের ধর্মশিক্ষা, সদাচরণ, রাজনীতির শিক্ষা দিতেন। স্বদেশ, স্বভাষার অভিমান জাগিয়ে তুলতেন। অনেক রাজা তাঁর শিষ্য হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজী রাজাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবনাকে মিটিয়ে একতা এবং স্বদেশাভিমানের বিচার উৎপন্ন করতে চলেছিলেন। উনি

ভাবতেন যে যদি সমস্ত দেশীয় রাজা সুশাসন এবং সদাচারের পালনা করে রাষ্ট্রীয় গৌরবের বিচারে পরস্পর সহমতিতে থাকতে শুরু করে তাহলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে স্বধর্ম, স্বভাষা, সংস্কৃতির পক্ষকে বলশালীভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারবে। এর ফল এই হবে যে খ্রীষ্টান পাদরী এবং ইসলামী মৌলবী অরক্ষিত হিন্দুদেরকে খ্রীষ্টান, মুসলমান করার কার্য্য এত সহজে করতে পারবে না।

যোধপুরের দিকে

উক্ত ক্রমে উনি গোয়ালিয়র, মসূদা, জয়পুর, উদয়পুর ইত্যাদি সমস্ত রাজ্যে উপদেশ করতে করতে, জাগরণের ভাবনা জাগাতে চলেছিলেন। স্বামীজীর খ্যাতি শুনে মহারাজা যোধপুরও স্বামীজীকে উপদেশ দিতে, ধর্মপ্রচার করার জন্য যোধপুর আসার জন্য আমন্ত্রিত করলেন। যোধপুরের মরুভূমি অতি কঠিন প্রতিকূল ছিল। সেখানে পাখন্ডের প্রভাবও ভয়ানক ছিল। লোকেরা আতঙ্কিত ছিল যে স্বামীজীর দ্বারা উগ্র এবং কঠোর খন্ডন সেখানে সহ্য হবে না এবং সেখানে বেশ কিছু অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভক্তেরা স্বামীজীকে যোধপুরে অতি সামান্যরূপে খন্ডন করার অনুরোধ করল। স্বামীজীর উত্তর নির্ভীক এবং বিনা কোন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সোজা উত্তর ছিল—

পাপের পাহাড়কে কাটার জন্য কুঠার চালাতে হয়, পাহাড়কে কখনও নারুন (NAIL CUTTER) দিয়ে কাটা যায় না।

সত্যের রক্ষা এবং তাঁর প্রচারের জন্য যদি স্বামীজীকে নিজের প্রাণও দিতে হয় তাহলেও তিনি প্রসন্নতাপূর্বক প্রস্তুত ছিলেন।

তাঁর উদ্‌ঘোষ ছিল—

"অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।"

মৃত্যু আজ হোক বা যুগ যুগ পরে, ধীর মনুষ্য সত্যের পথকে পরিত্যাগ করে না। এই দৃঢ় নিশ্চয়ের সাথে স্বামীজী তাং ৩১ মে ১৮৮৩-তে যোধপুরে পৌঁছে মহারাজা এবং সামান্য লোকেদের উপদেশ দিয়ে তৃপ্ত করতে লাগলেন।

দুঃখদ দেহান্ত

স্বামীজী একজন সত্যনিষ্ঠ সংস্কারক ধর্মোপদেষ্টা সন্ন্যাসী ছিলেন। সংস্কারের অর্থই হল খারাপের, পাখন্ডের বিরোধ। কখনও-কখনও কুরীতি এবং পাখন্ডের খন্ডন করার সময় ভাষা এবং তর্ক কটু এবং কাঁটার মতো হৃদয়ে ফুটে যাওয়ার মতো হয়েই যায়। স্বামীজীর উপদেশে মহারাজা, মন্ত্রীরা, অন্য অধিকারীরা লাভ তো নিতেই ছিল কিন্তু এক বর্গ ভিতরে ভিতরে বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। বলা হয় যে মহারাজার এক পছন্দকরা বেশ্যা নন্‌হী জান ছিল। একদিন স্বামীজী মহলে পৌছেছেন তখন নন্‌হী পালকীতে বসতে যাচ্ছিলেন। স্বামীজীকে আসতে দেখে মহারাজাও পালকীতে বসানোর জন্য তাঁর সহায়তা করে দিল। স্বামীজী দেখে নিলেন এবং তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। ফলস্বরূপ অসন্তুষ্ট ক্ষুব্ধ অধিকারীবর্গের সহযোগে স্বামীজীর পাচককে মিলিয়ে নিয়ে স্বামীজীর দুধে মারাত্মক বিষ দিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাকে ক্রিয়ান্বিত করা হল। এটি ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩-র ঘটনা বলে বলা হয়। যা যা ঔষধ দিয়ে উপচার করা হচ্ছিল তাতে অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে লাগল। জলবায়ু পরিবর্তনের দৃষ্টিতে স্বামীজীকে আবু পর্বতে নিয়ে আসা হল। ওখানেও কোনো লাভ হল না। প্রযত্ন চলতেই লাগল কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছিল না। অন্ততঃ আলোকের পূর্ব দীপাবলীর সন্ধ্যা, ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৩-তে স্বামীজী 'ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। তুমি খুব ভালো লীলা করলে''—বলে প্রাণত্যাগ করলেন। ওদিকে সূর্য্য অস্ত গেল এবং লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটি দীপাবলীর দীপক জ্বলে উঠল। এদিকে বেদবিদ্যার মহান সূর্য্য অস্ত গেল এবং মহান ঋষি স্বয়ং মৃত্যুবরণ করেও ম্রিয়মাণ জাতিকে জাগিয়ে দিয়ে প্রভুর শরণাপন্ন হয়ে গেলেন—

> **"রবির্গতঃ কিন্তু সুদীপ্য তারকাঃ,**
> **অজিজ্বলদ্দীপক কৌটিশঃ পুনঃ।**
> **ইহত্যকে পর্বণি দীপ মালিকে,**
> **মৃতোপ্যহো কশ্চিদ্জীবয়ন্ মৃতান্।।"**

সূর্য্য অস্ত গেল এবং কোটি কোটি দীপক জ্বলে উঠল। এদিকে স্বামীজী মৃত্যু বরণ করেও ম্রিয়মান জাতিকে জীবন দিয়ে গেলেন।

বেদ এবং স্বামী দয়ানন্দ

卐

- বেদোঽখিলোধর্মমূলম্
- সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ
- বেদোনিত্যমধীয়তাম্

—মনু—

বেদ সমস্ত সত্য বিদ্যার পুস্তক। বেদকে পড়া—পড়ানো এবং শোনা—শুনানো সব আর্য্যদের (শ্রেষ্ঠ মনুষ্যদের) পরম ধর্ম।

স্বামী দয়ানন্দ (আর্য্য সমাজের তৃতীয় নিয়ম)

বেদ এবং স্বামী দয়ানন্দ

বেদ শব্দের অর্থ হল 'জ্ঞান'। সংস্কৃতে 'বিদ্‌জ্ঞানে' এই ধরণের ধাতুপাঠ আছে। এ তো হল বিদ্বান্‌দের কথাবার্তা কিন্তু সামান্যরূপে বেদ চারটি পুস্তকের নামের অর্থে প্রয়োগ করা হয়। বেদে মন্ত্রের সংগ্রহ আছে। এইজন্য তাঁকে 'সংহিতা' বলা হয়। চার বেদের নাম হল—(১) ঋগ্বেদ, (২) যজুর্বেদ, (৩) সামবেদ এবং (৪) অথর্ববেদ। আয়তনের দৃষ্টিতে ঋগ্বেদ হল সব থেকে বড়। এতে মন্ত্রের সংখ্যা হল ১০, ৫৫২। যজুর্বেদে ১৯৭৫ মন্ত্র। সামবেদে ১৮৭৫ এবং অথর্ববেদে ৫৯৭৭। এই মন্ত্রের সংখ্যা নিয়ে বিদ্বান্‌দের মধ্যে কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু এই মতভেদ বেদ-মহিমার দৃষ্টিতে অতি নগণ্য।

বেদের মহত্ত্ব

সংসারের বিদ্বানবর্গের কাছে বেদের মহত্ত্ব অনেক পরিপ্রেক্ষিতে অত্যধিক। কেউ বেদকে ঈশ্বর প্রদত্ত-প্রেরিত-অপৌরুষের মানুক অথবা না মানুক, তাকে ধার্মিক গ্রন্থ মানুক অথবা না মানুক, কেউ তাকে মনুষ্যমাত্রের জন্য পরমেশ্বর প্রদত্ত মানছে অথবা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য মানছে কিন্তু একথা সত্য সংসারের সমস্ত জ্ঞানসিক্ত বিদ্বানদের একটিই মত হল যে বেদ মানব

সভ্যতার সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রসিদ্ধ বৈদিক বিদ্বান্ মোক্ষমূলর যখন থেকে বলেছেন যে ঋগ্বেদ সংসারে মানবের পুস্তকালয়ে সবথেকে প্রাচীন গ্রন্থ তখন থেকে এটি বাগ্‌ধারার মতো হয়ে গেছে যে ঋগ্বেদ মানব সভ্যতায় প্রাচীনতম গ্রন্থ। এর অর্থ হচ্ছে যে বেদ সংহিতা মানুষের জন্য আদিকালের চিন্তন-মনন-বিচারের লিখিত দস্তাবেজ। আর কিছু হোক না হোক, কিন্তু বেদ সেই প্রাচীন চিন্তন মননের লিখিত প্রমাণ, এটি তার ঐতিহাসিক মহত্ত্বকে অত্যধিক বাড়িয়ে দেয়। বেদ এমন একটি লিখিত দস্তাবেজ যাতে আজ পর্যন্ত কোন পরিবর্তন অথবা পাঠভেদ হয়নি। ভারতের বেদ ভক্তবিদ্বান তো বলেন—মহাভারতের শান্তিপর্বের একটি শ্লোক—

"অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ংভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বা প্রবৃত্তয়ঃ।। (অ. ২৩২-২৪)

এর ভাবার্থ হল যে স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে 'দিব্যা নিত্যা বেদময়ী বাক্ উৎসৃষ্টা', দিব্য এবং নিত্য বেদময়ী বানীর প্রকাশ করেছেন, তার থেকেই সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তি, সম্পূর্ণ ব্যবহার সিদ্ধ হয়ে থাকে।

শতপথ ব্রাহ্মণগ্রন্থে ঋষি যাজ্ঞবল্ক মৈত্রেয়ীকে বলছেন—

"এবং বা অরেহস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্।
যদ্ ঋগ্বেদোহযজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ।।
(শত. ব্রা-১৪-৫-৪-১০)

—অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ী! সেই মহান্ পরব্রহ্ম থেকে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ শ্বাস-প্রশ্বাসের সমান প্রকট হয়েছে।

বেদে পাঠ-পরিবর্তন নাই

ইউরোপের বিধর্মী বিদ্বান্ও এটি স্বীকার করে যে, এত সুদীর্ঘ কাল পূর্ব থেকে প্রচলিত বেদে আশ্চর্য্যজনকরূপে পাঠভেদ অথবা পাঠ পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই—

প্রো. মোক্ষমূলর লিখেছেন—

"The texts of the Veda have been handed down to us with such accuracy that there is a hardly a various reading in the proper sense of the word or even an uncertain accent in the whole of the Rigveda." (origin of Religion, Page-131)

অর্থাৎ বেদের পাঠ আমাদের কাছে এত শুদ্ধরূপে পৌঁছেছে যে সম্পূর্ণ ঋগ্বেদে না কোনো পাঠভেদ অথবা পরিবর্তন হয়েছে এবং না কোনো স্বরে ভেদ রয়েছে।

প্রো ঃ—মোক্ষমূলর বেদের পাঠ এবং স্বরের শুদ্ধতার সম্বন্ধে এতখানি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন যে উনি উক্ত কথা অন্যত্রও অনেক জায়গাতে বলেছেন—

As far as we are able to judge at present, we can hardly speak of various readings in the Vedic hymns in the usual sense of that word. Various readings to be gathered from collections of different manuscripts, now accessible to us, there are none. (The Rigveda Volume-1, P-30)

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ণয় করার সামর্থ্য এই সময় রয়েছে, বেদ মন্ত্রে কোথাও কোন পাঠভেদ উপলব্ধ হয় নি। এই ধরণের পাঠভেদ অথবা ভিন্ন-ভিন্ন পাঠ বিবিধ হস্তলিখিত উপলব্ধ কোনও কাগজে কোথাও নাই।

এত সুদীর্ঘকালেও বেদের সংহিতাগুলি পাঠভেদ অথবা সন্নিবেশ-প্রবেশ, প্রক্ষেপক, কাটছাঁট থেকে সুরক্ষিত বেঁচে রয়েছে, এর জন্য মানব সমুদায় সেই বৈদিক বিদ্বানদের কাছে কৃতজ্ঞ যাঁরা নিজেদের আনুবংশিক ধর্ম মেনে বেদের মন্ত্রগুলিকে সস্বর নিজেদের স্মৃতিতে সুরক্ষিত রেখেছেন। মুসলমান শাসকেরা প্রায় বহুসংখ্যক পুস্তকগুলিকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তা সত্ত্বেও বৈদিক বিদ্বান কণ্ঠাগ্র করে আশ্চর্য্যজনকরূপে বেদের রক্ষা করতে পূর্ণতঃ সফল হয়েছেন।

বেদের সম্বন্ধে মানবসমুদায়কে দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক সমুদায় হল সেই সব লোকেদের, যাঁরা বেদকে নিজের ধর্মগ্রন্থ, ধর্মশাস্ত্র স্বীকার করে। বেদকে নিজের ধর্মশাস্ত্র মানা লোক প্রায় ভারতবর্ষের আর্য্য (হিন্দু)। এইসব ভারতীয় মূলের লোক প্রায় সমস্ত দেশে প্রবাসী হয়ে রয়েছে। এই আর্য্য (হিন্দু) যাঁরা বেদকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ মানে তাঁরা সবাই বেদকে স্বতঃ প্রমাণও মানে। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থ ততদূর পর্য্যন্ত প্রমাণ যতদূর পর্য্যন্ত সে বেদানুকূল। যদি কোনো ধর্মশাস্ত্র বেদের বিরুদ্ধে হয় তাহলে সে ধর্মকার্য্যের জন্য প্রমাণ নয়। অন্য সমুদায় সেই সব লোকেদের যাঁরা বেদকে ধর্মগ্রন্থ মানে না। যে ধর্ম ভারতীয় মূলের নয় যেমন ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান আদি তাঁরা বেদকে ধর্মগ্রন্থ রূপে মানে না। হিন্দুমূলেরও জৈন, বৌদ্ধ আদি সমুদায় যাঁরা বেদকে ধর্মশাস্ত্ররূপে মানে না, এইটুকুই নয়, অনেক

চার্বাক্ আদি বেদের ঘোর নিন্দাও করেন। তা সত্ত্বেও, বেদের ঐতিহাসিক মহত্ত্বকে সবাই স্বীকার করেন।

দুইটি ধারার তুলনা

মূল আর্য্য লোক যারা বেদকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ মানে তাদের মধ্যেও দুইটি সমুদায় রয়েছে—

(১) সনাতনধর্মী ঃ এঁরা স্বামী দয়ানন্দকে বাদ দিয়ে নূতন-পুরনো সমস্ত আচার্য্যদিগকে মেনে থাকেন, তাঁদের বেদভাষ্যকে প্রমাণরূপে পুর্নতঃ স্বীকার করেন। বেদের প্রাচীন ভাষ্যকারদের মান্যতা এবং বেদার্থে এবং নবীন ভাষ্যকারদের মধ্যে মূলতঃ সিদ্ধান্ততঃ ভেদই নয়, অপিতু বিরোধও রয়েছে। নবীন ভাষ্যকারদের মধ্যে সায়ণ হলেন মুখ্য। মহীধর, উব্বট ইত্যাদি আরও নবীন ভাষ্যকার রয়েছেন। কিন্তু সায়ণ হলেন প্রধান। তাঁর ভাষ্য বেদের চারটি সংহিতাতে উপলব্ধ রয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী মাধ্যান্দিনি শাখার উপর আচার্য্য সায়ন কোনো ভাষ্য লিখেন নি। সায়ণের ভাষ্য কণ্বশাখার উপর রয়েছে। বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিনী শাখার উপর আচার্য্য উব্বট এবং আচার্য্য মহীধরের ভাষ্য উপলব্ধ আছে। সনাতন ধর্মে এই সমস্ত ভাষ্যগুলিকে প্রামাণিক মানা হয়। সনাতনধর্মী কেবল এক স্বামী দয়ানন্দের ভাষ্যকে মানে না অপিতু বিরোধ করে থাকে। অন্য সবকে না দেখেই প্রমাণ মেনে নেয়।

(২) আর্য্য সমাজী ঃ স্বামী দয়ানন্দের অনুযায়ী। তাঁরা নিরুক্ত আদি আর্য ভাষ্য এবং স্বামী দয়ানন্দের ভাষ্যকে মানে। স্বামী দয়ানন্দের জীবন কেবল ৫৮ বছরের ছিল (১৮২৪-৮৩) তার মধ্যে কার্যকাল ২০ বছর পেয়েছিলেন (১৮৬৩-১৮৮৩)। লেখার কাজ তো উনি ১০ বছরের (১৮৭৩-১৮৮৩) পূর্ণতাকেও প্রাপ্ত করতে পারেননি। উপর থেকে সহযোগীও খুব কম ছিল। বিরোধী ছিল অনেক এবং প্রবল, সাধন-সম্পন্ন। এই ১০ বছরও পূর্ণতঃ লেখন কার্য্যকে সমর্পিত হতে পারেন নি। নিত্য ব্যাখ্যান, শাস্ত্রার্থ, পত্র এবং বিজ্ঞাপন আদির লেখা, যাত্রা, টাকাকড়ির ব্যবস্থা, সবকিছুর ব্যবস্থা স্বামীজীকেই করতে হত। তা সত্ত্বেও দশ বছরেরও কম সময়ে উনি যত সাহিত্য নির্মাণ করে গেছেন, যে স্তরের, যে বৈদুষ্যের সাহিত্য উনি দিয়ে গিয়েছেন—এসব ছিল অপ্রতিম প্রতিভা এবং যোগ সাধনার ফল। আমরা তাঁর বেদভাষ্যের চর্চা করছিলাম। স্বামী দয়ানন্দ যজুর্বেদের সম্পূর্ণ ভাষ্য

লিখেছেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মন্ডলের ৬১ সূক্তেরই ভাষ্য করতে পেরেছিলেন তখনই তাঁর দেহান্ত হয়ে যায়। তাঁর ভাষ্যে মন্ত্রের ছন্দ, স্বর, ঋষি, দেবতা, পদপাঠ, পদার্থান্বয়, সংস্কৃত ভাষ্যের সাথে সাথে কেবলমাত্র হিন্দী জানা লোকেদের জন্য মন্ত্রের শব্দার্থ এবং ভাবার্থ হিন্দীতেও প্রাপ্ত হয়।

আচার্য্য সায়ণ এবং মহীধর ইত্যাদি তথাকথিত সনাতনধর্মের অনুযায়ী ভাষ্যকারদের ভাষ্যে এবং স্বামী দয়ানন্দের ভাষ্যে সিদ্ধান্তমূলক পার্থক্য রয়েছে। এই মৌলিক পার্থক্যের কারণে ভাষ্যের মধ্যে স্বতঃই পার্থক্য অথবা বিরোধ হওয়া স্বাভাবিক হয়ে যায়। একটি দুটি বিন্দুর উপর বিচার করলে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এই ভাষ্যে পার্থক্য হল মুখ্যতঃ দৃষ্টিকোণের। দৃষ্টিকোণ ভেদ হলে পর ভাষ্যতেও ভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। দুটি সমুদায়ের মধ্যে ভেদ তো আছেই, সাথে সাথে সমানতাও আছে।

উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানতার বিন্দু নিম্নরূপ হতে পারে—

(১) বেদ হল ঈশ্বরকৃত—সায়ণ এবং দয়ানন্দ তথা অন্যান্য ভাষ্যকারেরা বেদকে ঈশ্বরকৃত বলেছেন। সায়ণাচার্য্য তাঁর নিজের উপোদঘাতে লিখেছেন—

"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহংবন্দে বিদ্যাতীর্থং মহেশ্বরম্॥"

অর্থাৎ—শ্বাসের সমান যার থেকে বেদের আবির্ভাব হয়েছে এবং সেই বেদজ্ঞান থেকে যিনি সম্পূর্ণ জগতের নির্মাণ করেছেন, সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরের আমি বন্দনা করছি।

স্বামী দয়ানন্দ ঋগ্বেদাদি-ভাষ্য-ভূমিকাতে বেদোৎপত্তি বিষয়ে লিখেছেন—

"তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত।" যজু-২১-৭

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সচ্চিদাদি লক্ষণাৎ পুর্নাৎ পুরুষাৎ সর্বহুতাৎ সর্বপূজ্যাৎ সর্বোপাস্যাৎ সর্বশক্তিমতঃ পরিব্রহ্মণঃ ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ববেদশ্চ, চত্বারো বেদাস্তেনৈব প্রকাশিতা ইতিবেদ্যম্।

অর্থাৎ—সচ্চিদানন্দ লক্ষণযুক্ত পূর্ণপুরুষ সর্বপূজ্য সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ—চারবেদকে উৎপন্ন করেছেন।

(২) স্বতঃপ্রমাণ—বেদকে মানে এইরকম আচার্য্য সবাই একমত যে বেদ হল স্বতঃপ্রমাণ। সায়ণাচার্য্য লিখেছেন—

"যথা ঘটপটাদি দ্রব্যাণাং স্বপ্রকাশকত্বাভাবেঽপি সূর্যচন্দ্রাদীনাং

স্বপ্রকাশকত্বম্ বিরুদ্ধং, তথামনুষ্যাদীনাং স্বকন্ধারোহাসংভবেঽপি অকুণ্ঠিত শক্তের্বেদস্য ইতরবস্তু প্রতিপাদকত্ববৎ স্বপ্রতিপাদকত্বমপ্যস্তু।"

—এর ভাবার্থ হল যে, যেমন কলসী, কাপড় আদি বস্তু সব নিজের প্রকাশে দেখা যায় না কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্রাদি অর্থাৎ নিজের প্রকাশে সূর্য্যচন্দ্র আদি নিজেকেও দেখায় এবং অন্য বস্তুকেও দেখায়। এইরকম বেদও নিজের প্রকাশও করে এবং অন্যান্য বস্তুরও প্রকাশ করে।

স্বামী দয়ানন্দজীও বেদকে স্বতঃপ্রমাণ মানেন। উনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা গ্রন্থে প্রমাণাপ্রামাণ্য বিষয়ে লিখেছেন—

"যে ঈশ্বরোক্তা গ্রন্থাস্তে স্বতঃপ্রমাণং কর্তুং যোগ্যাঃ সন্তি, যে জীবোক্তাস্তে পরতঃ প্রমাণার্হাশ্চ। ঈশ্বরোক্তাচ্চ চত্বারো বেদাঃ স্বতঃ প্রমাণম্।

বেদেষু বেদানামেব প্রামাণ্যং স্বীকার্যং সূর্য্য প্রদীপবৎ। যথা সূর্যঃ প্রদীপশ্চ স্বপ্রকাশেনৈব প্রকাশিতৌ সন্তৌ সর্বমূর্তদ্রব্য প্রকাশকৌ ভবতঃ, তথৈব বেদাঃ স্বপ্রকানেনৈব প্রকাশিতাঃ সন্তঃ সর্বানন্যবিদ্যাগ্রন্থান্ প্রকাশয়ন্তি।"

অর্থাৎ—ঈশ্বরোক্ত গ্রন্থ হল স্বতঃপ্রমাণের যোগ্য। যে গ্রন্থ জীবোক্ত সেটা হচ্ছে পরতঃ প্রমাণ। ঈশ্বরোক্ত হওয়ার জন্য চার বেদ হল স্বতঃপ্রমাণ।

অতএব বেদে বেদকেই প্রমাণ মানা উচিৎ। যেমন সূর্য্য হল স্বপ্রকাশ। যেমন সূর্য্য এবং দীপক স্বয়ং তার নিজের প্রকাশ করে অন্য সাকার পদার্থগুলিকে প্রকাশিত করে ঠিক সেইরকম বেদ স্বয়ং তাঁর প্রকাশ করে অন্য বিদ্যার গ্রন্থকেও প্রকাশিত করে।

(৩) বেদের আবির্ভাব চার ঋষির উপর—সায়ণাচার্য এবং স্বামী দয়ানন্দ দুইজনেই মানেন যে বেদের আবির্ভাব চার ঋষির মধ্যে হয়েছে। সায়ণাচার্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থের উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন—

"জীব বিশেষৈরগ্নিবায়্বাদিত্যৈর্বেদানামুৎপাদিতত্বাৎ ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত যজুর্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাৎ (ঐত-৫-৩২) ইতি। শ্রুতেঃ ঈশ্বরস্য অগ্ন্যাদি প্রেরকত্বেন নির্মাতৃত্বং দ্রষ্টব্যম্।"

অর্থাৎ—জীব বিশেষ অর্থাৎ পুরুষ বিশেষের দ্বারা বেদ প্রাদর্ভূত হল, অগ্নির দ্বারা ঋগ্বেদ, বায়ু থেকে যজুর্বেদ, এবং আদিত্যনামক ঋষি বিশেষ থেকে সামবেদ। এখন যেহেতু অগ্নি আদি ঋষিদেরকে ঈশ্বরের প্রেরণা থেকে বেদের আবির্ভাব হয়েছে। অতঃ ঈশ্বরের নির্মাতৃত্ব অর্থাৎ বেদের নির্মাতা হলেন ঈশ্বর।

স্বামী দয়ানন্দ 'ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা'তে বেদোৎপত্তি বিষয়ের অন্তর্গত লিখেছেন—চারবেদ চার ঋষিদের দ্বারা প্রাদুর্ভূৎ হয়েছে।

"কেষাং? অগ্নিবায়্যদিত্যাংগিরসাম্। সৃষ্ট্যাদৌ মনুষ্যদেহধারিণস্তে হ্যাসন্।"

প্রশ্ন হল কোন কোন ঋষির দ্বারা? উত্তর দেওয়া হল—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অংগিরার দ্বারা। সৃষ্টির আদিতে এঁরা সব দেহধারী মনুষ্য ছিলেন। এতো হল কিছু সমানতার কথা। যাঁকে স্বামী দয়ানন্দ এবং মধ্যকালীন আচার্য্য সায়ণ, মহীধর ইত্যাদি সমস্ত স্বীকার করেন। কিন্তু এমন বেশকিছু কথা রয়েছে যাতে পরস্পর মতভেদ আছে। সর্বপ্রথম তো এইটাই মহত্বপূর্ণ যে বেদ কি?

মতভেদ অথবা বিরোধ

বেদ অপৌরুষেয়, ঈশ্বররচিত, সর্বমান্য, স্বতঃপ্রমাণ—তা সত্ত্বেও বেদ কি? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

(১) বেদ কি কেবল মন্ত্রসংহিতা গ্রন্থ বা মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থ দুইটিই বেদ? আচার্য্য সায়ণ বলেছেন যে আপস্তম্ব যজ্ঞের পরিভাষাতে বলেছেন—

"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদ নামধেয়ম্" (আপ-পরি ১-৩৩)

অর্থাৎ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুটির নাম হল বেদ।

একে দেখলে মনে হয় যেন সায়ণ আদি আচার্য্যদের সামনে কোন বাধ্যতা ছিল যে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মুখ থেকে বলা কথা থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে ঋগ্বেদের আবির্ভাব অগ্নিঋষির দ্বারা, যজুর্বেদের বায়ুঋষির দ্বারা, সামবেদ আদিত্য ঋষির উপর এবং অথর্ববেদ অঙ্গিরা ঋষির দ্বারা হয়েছে। এখানে চারটি ব্রাহ্মণ (গ্রন্থ)—ঋগ্বেদের ঐতরেয়, যজুর্বেদের শতপথ, সামবেদের সাম ব্রাহ্মণ এবং অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণের কোনো কথাই ছিল না। এদেরকে পরে বেদের ব্যাখ্যা রূপে ঋষিরা লিখেছেন।

আবার বেদ সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ এক কি করে হয়ে গেল?

স্বামী দয়ানন্দ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ—দুইটিই হল বেদ—এর অতি দৃঢ়তার সাথে বিরোধ করেছেন। কেননা, অনেক অনেক অনর্থ এই কারণেই হয়েছে। সায়ণাচার্য আদিরা ব্রাহ্মণ গ্রন্থকে বেদ স্বীকার করে তাকেও "স্বতঃ প্রমাণ" মেনে নিয়েছেন।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ বেদ নয়

স্বামী দয়ানন্দ স্বয়ং প্রশ্ন করে বলেছেন—"ব্রাহ্মণ গ্রন্থ কি বেদ?" তাঁর স্পষ্ট উত্তর হল—"না, বেদ তো মন্ত্রভাগ সংহিতা-ই।" আগে স্বামীজী বলছেন—

"কিংচ মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধ্যেয়ম্ ইতি কাত্যায়নোক্তের্ব্রাহ্মণভাগস্যাপি বেদসংজ্ঞা কুতো ন স্বীক্রিয়তে?"

—আচ্ছা, তাহলে কাত্যায়ন বলেছেন যে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ দুটোরই হল বেদসংজ্ঞা, এঁকে কেন স্বীকার করছেন না?"

স্বামী দয়ানন্দ বলছেন—"ব্রাহ্মণগ্রন্থ বেদ হতে পারে না। কেন? এঁর নিম্ন কারণ রয়েছে—

(১) এর পুরাণ এবং ইতিহাস সংজ্ঞা রয়েছে।

(২) এ হল বেদের ব্যাখ্যা

(৩) ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কর্তা হল ঋষিরা

(৪) এ ঈশ্বরপ্রোক্ত নয়

(৫) কাত্যায়ন ছাড়া অন্য কোনো ঋষি একে বেদ মানে না

(৬) এ হল মানুষের বুদ্ধির রচনা

এটি একটি মহত্ত্বপূর্ণ সমস্যা যে বেদে পশুবধ, মাংসভক্ষণ, যজ্ঞে হিংসা, গোবধ সবাইয়ের নিষেধ আছে কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থে কোথাও কোথাও এই বেদবিরোধী মান্যতারও বিধান রয়েছে। অতঃ পরম অহিংসক লোক বেদের প্রতি উপেক্ষা দৃষ্টি। গৌতম বুদ্ধ এই হিংসার কারণেই বেদকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিকে বেদরূপে মেনে নেওয়ার এই ভয়ানক পরিণাম হয়েছিল।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনি আপ্তপুরুষ ছিলেন। তাঁর প্রমাণ হল সর্বমান্য। এই মহামুনি আপ্তবিদ্বান্ নিশ্চয়াত্মকভাবে লিখেছেন যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হল বেদের ব্যাখ্যা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সুস্পষ্ট সম্মতি দ্রষ্টব্য ঃ—

"চতুর্বেদবিদ্ভির্ব্রাহ্মভির্ব্রাহ্মাভির্ব্রাহ্মণৈর্মহর্ষিভিঃ প্রোক্তানি যানিবেদব্যাখ্যানি তানি ব্রাহ্মণানীতি॥" (মহাভাষ্য ৫-১-১)

—অর্থাৎ চারবেদের বিদ্বান্ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ এবং মহর্ষিগণ বেদের যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই হল ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।

আচার্য্য সায়ণ আদি তাঁর নিজের ভ্রষ্ট সাম্প্রদায়িক মান্যতাগুলিকে পুষ্ট ও প্রামাণিক করার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগ্রন্থকেও বেদ প্রতিপাদিত করেছেন যাতে তারা সংহিতাগ্রন্থের মতো 'স্বতঃপ্রমাণ'-এর শ্রেণীতে মান্য হয়ে যায়।

(২) সায়ণ আদি আচার্য্য বেদে মানব ইতিহাস স্বীকার করেন। স্বামী দয়ানন্দ বেদে মানব ইতিহাস মানেন না। সৃষ্টির আদিতে ইতিহাসের সম্ভাবনাই কি করে হবে? ইতিহাস তো সেই গ্রন্থে সম্ভব হবে যা সৃষ্টি নির্মাণের কিছুদিন পরে তৈরি হয়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইতিহাস আছে কেননা সে সৃষ্টির পরে রচিত হয়েছে। অতঃ বেদেও ইতিহাসের ভ্রম হয়ে গেছে। বস্তুতঃ বেদে ইতিহাস নেই।

যেখানে যেখানে রাজাদের, নগরের, নদীর, ঋষি আদির নাম আসে সেসব ব্যক্তিবাচক নাম নয় অপিতু সেসব যৌগিক এবং সার্থক বিশেষণ। উদাহরণার্থ বেদে দেবপুরী অযোধ্যা—"**দেবানাম্ পূরঃ অযোধ্যা** (অথর্ববেদ-১০-২-৩১) আছে। এ রঘুবংশী রাজাদের রাজধানী অযোধ্যা নয়। অযোধ্যার অর্থ হল—"**ন যোদ্ধুং শক্যা**"—যে পুরীতে যুদ্ধ করা যেতে পারে না। এই দেবপুরী হল মনুষ্য শরীর। বেদে অযোধ্যা পুরী নাম দেখে রঘুবংশীরা নিজেদের রাজধানীর নাম অযোধ্যা রেখে ছিল। এইরকমই ঋগ্বেদের এক মন্ত্রে কৃষ্ণ এবং অর্জুন দুইটি শব্দের প্রয়োগ রয়েছে কিন্তু এই দুইটি হল বিশেষণপদ, সংজ্ঞা (কারও নাম নয়) নয়।

"অহশ্চকৃষ্ণমহরর্জুনং চ, বিবর্তেতে রজসীবেদ্যাভিঃ" (ঋগ্ ৬-৯-১)—কৃষ্ণং অহঃ (কালা দিন-রাত্রি) অর্জুনং অহঃ (শ্বেত দিন) অর্থাৎ রাত এবং দিন জ্ঞাতব্য ঘটনাগুলির সাথে পৃথিবী এবং দ্যৌলোকের মধ্যে ঘুরতে থাকে। এখানে মহাভারতের কৃষ্ণ-অর্জুনের কোন অর্থ নেই।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইতিহাস আছে, বেদে নাই। এটি বিশুদ্ধরূপে নিজের সাম্প্রদায়িক মান্যতাগুলির পোষণের জন্য এবং লোকপ্রচলিত কাহিনীগুলিকে বেদমূলক সিদ্ধ করার প্রয়াসমাত্র যে বেদে মানব ইতিহাস রয়েছে।

(৩) সায়ণ আদি আচার্য্যগণ ব্যাখ্যা যজ্ঞপরক এবং প্রচলিত লোকগাথার উপর আধার করে করেছেন। স্বামী দয়ানন্দ বেদে যজ্ঞের বিধিবিধানের সাথেই সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্যবিদ্যার বীজরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বেদে ধর্মশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, রাজনীতি, গণিত, বিদ্যুৎ, রেল, তার বায়ুযান ইত্যাদি সমস্ত বিদ্যার বীজরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি আর্য্যসমাজের একটি নিয়মই তৈরি করে দিয়েছেন—"বেদ সমস্ত বিদ্যার পুস্তক। বেদকে পড়া-পড়ানো, শুনা-শোনানো সব আর্য্যদের পরমধর্ম।

বিরোধের বিন্দু অনেক কিন্তু মূল মান্যতাগুলির আধারে বেদের বাস্তবিক অর্থকে বোঝা যেতে পারে।

(৪) স্বামী দয়ানন্দ বেদে এক ঈশ্বরের বর্ণনাকে মানেন। অগ্নি, ইন্দ্র; বরুণ, রুদ্র আদি সব ঈশ্বরের গুণযুক্ত নাম। এইসব নামকে গুণবাচী বিশেষণ বোঝা উচিৎ। ঋগ্বেদে একটি মন্ত্র আছে—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সঃ সুপর্ণো গরুৎমান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥ (ঋ-১-১৬৪-৪৬)

—সেই পরমেশ্বর তো একই, হ্যাঁ, বিদ্বান্ তাঁকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি অনেক নামে ডাকে।

হ্যাঁ, শ্লেষালংকার আদি অলংকারের দ্বারা সূর্য্য, বিদ্যুৎ আদি ভৌতিক পদার্থ, এবং রাজা, সেনাপতি, বৈদ্য, বিদ্বান্ আদি অর্থেও উক্ত শব্দগুলির প্রয়োগ হয়। কিন্তু যতদূর পর্য্যন্ত ঈশ্বর এবং উপাসনার প্রশ্ন—সেখানে বেদে একেশ্বরবাদ এবং এক ঈশ্বরই হলেন উপাস্য।

(৫) বেদে যজ্ঞে পশুবলি, নরবলি, মাংসভক্ষণ, দুরাচার, অশ্লীলতা ইত্যাদি নেই।

সায়ণাচার্য্য অথবা মহীধরাচার্য্য আদি ভাষ্যকারগণের ভাষ্যে এই প্রকারের যে বর্ণনা আছে তা হল অশুদ্ধ, অনার্য্য, সাম্প্রদায়িক মান্যতাপূর্ণ। এইসব আচার্য্যদের নিজেদের সাম্প্রদায়িক মান্যতাতে দেবীকে পশুবলি আদি দেওয়া হত। তাই তার সমর্থনে বেদমন্ত্রকে খোঁজা এবং কর্মকান্ডে ঐসব মন্ত্রের বিনিয়োগ হল সাম্প্রদায়িক বাধ্যতা।

(৬) মন্ত্রের অর্থ করার সময় মন্ত্রকে বিনিয়োগের পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। মন্ত্রের অর্থ স্বতন্ত্র। ঈশ্বর মন্ত্রকে বিনিয়োগের জন্য দেন নি। কোনো কর্মকান্ডে যে মন্ত্র পড়া হয় সেই কর্মে সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ বলা হয়। কর্ণবেধ হল একটি সংস্কার। এতে কানে ছিদ্র করা হয়। কর্ণবেধে মন্ত্র পড়া হয়—"**ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা**" ইত্যাদি। এর অর্থ হল যে আমরা যেন কান দিয়ে ভদ্র অর্থাৎ শুভ শুনি। আগে এই মন্ত্রে রয়েছে যে আমরা চোখ দিয়ে ভালো দেখি ইত্যাদি। কখনও কোনো ঋষি কর্ণছেদনে এঁর বিনিয়োগ করেছিলেন। তার মানে এই নয় যে এই মন্ত্র কানকে ছেদন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। স্বামী দয়ানন্দ মন্ত্রের অর্থ বিনিয়োগ থেকে পৃথক হয়ে সংহিতার সন্দর্ভ, মন্ত্রের দেবতা (বিষয়বস্তু অথবা তেনোচ্যতে সা দেবতা) আদির বিচার করে অর্থ করেছেন।

(৭) বেদ পড়ার অধিকার মনুষ্যমাত্রের জন্য। মনুষ্য যে কোনো জাতির হোক, যে কোনো দেশের হোক, বেদ সকলের জন্য। পৌরাণিক কালে স্ত্রীদেরকে, শূদ্রদেরকে বেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ মনুষ্যমাত্রকে বেদ পড়ার অধিকার দিয়েছিলেন।

স্বামী দয়ানন্দ ঋষি-মুনিদের দ্বারা লিখিত বেদের ব্যাখ্যার অনুকূল বেদভাষ্য করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ব্রহ্মা থেকে জৈমিনি পর্য্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্য আদি ঋষিরা ঐতরেয়, শতপথ, সাম, গোপথ আদি ব্রাহ্মণগ্রন্থের নির্মাণ করেছেন, পাণিনি, পতঞ্জলি, যাস্ক আদি বেদের ব্যাখ্যান, বেদাঙ্গ, ষট্‌শাস্ত্র, উপবেদ ইত্যাদিতে বেদের ব্যাখ্যার নির্মাণ করেছেন—স্বামী দয়ানন্দ সবকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু রাবণ, উব্বট, সায়ণ, মহীধর আদিকে যাঁরা বেদবিরুদ্ধ অনার্যভাষ্য করেছেন এবং তাদেরই অনুসরণ করে ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানী দেশে উৎপন্ন ইউরোপখণ্ড নিবাসীগণ নিজ-নিজ দেশীয় ভাষাতে স্বল্প ব্যাখ্যা করেছেন এবং করে যাচ্ছেন—সব অনর্থে ভরে রয়েছে। এই সবের পরিত্যাগই স্বামীজী করেন নি, অপিতু প্রমাণপূর্বক খন্ডনও করেছেন। আমাদের নিজেদের দেশ ভারতবর্ষের সমস্ত নূতন বিদ্বানেরা এই মধ্যকালীন বিদ্বান্ এবং ইউরোপীয় বিদ্বান্‌দের ভাষ্যগুলির আধারেই বেদার্থকে স্বীকার করেছেন।

সম্প্রদায়পোষক ভাষ্য

সায়ণাচার্য আদি ভাষ্যকার ঋষিগণের ব্যাখ্যা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, এর মুখ্য কারণ ছিল সাম্প্রদায়িক এবং লোক প্রচলিত কর্মকাণ্ডের পোষণ। সায়ণাচার্য মহান বিদ্বান্ ছিলেন কিন্তু বিজয়নগরম্ রাজ্যের বুক্ক নরেশদের আশ্রিত ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের সাম্প্রদায়িক মান্যতার পুষ্টির জন্য ঋষিদের মার্গ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। মহীধরাচার্য্যের শুক্ল যজুর্বেদ মাধ্যন্দিনি শাখার ভাষ্যে অশ্বমেধে রাজরানীর অশ্বের সাথে সমাগমের মতো অনেক অশ্লীল ভ্রষ্ট প্রসঙ্গ এসে গিয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেদার্থ কতদূর পর্য্যন্ত পথভ্রষ্ট হতে পারে তার নবীনতম উদাহরণ শ্রীস্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দের অর্থগুলি থেকে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়। স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী তাঁর নিজের বৈদুষ্যপূর্ণ গ্রন্থ "ভূমিকা ভাস্কর" ভাস এক তাঁর অবতরণিকার পৃষ্ঠ সংখ্যা ২১-এ লিখেছেন—

"মহামন্ডলেশ্বর শ্রীস্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দজী চারবেদের অত্যন্ত শুদ্ধ তথা

সুন্দর সংস্করণ তৈরি করে "বেদ ভগবান" নাম দিয়ে দেশ-বিদেশে অনেকত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতদর্থ সমস্ত বেদপ্রেমী তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। পরন্তু তাঁর নিজের বেদভাষ্য "বেদোপদেশ চন্দ্রিকা"-তে মন্ত্রের অনর্থ করে তিনি নিজেরই কৃতিকে মিটিয়ে দিয়েছেন। এই কার্য্যে তো তিনি সায়ণ, উব্বট, মহীধর ইত্যাদিকেও অনেক পেছনে রেখে দিয়েছেন।"

শ্রীস্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দজীর সাম্প্রদায়িকতার চমৎকার দেখার মতো। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র হল—"অগ্নিমীডে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।" শ্রীস্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দজী লিখেছেন—"এখানে অগ্নির অর্থ হনুমান। সৃষ্টিক্রমবোধক 'আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নি..." এই শ্রুতির অনুসারে আকাশ থেকে বায়ু এবং বায়ু থেকে অগ্নির উৎপত্তি হওয়াতে অগ্নির বায়ুপুত্র হওয়া স্পষ্ট। হনুমান পবনসুত নামে প্রসিদ্ধ। বেদ বলছে যে আমি বায়ুপুত্র অর্থাৎ হনুমানের স্তুতি করি।"

শ্রীগঙ্গেশ্বরানন্দজী বিনা কিছু অধিকমন্ত্র, দেবতা, সূক্ত, সন্দর্ভের ধ্যান রেখেই নিজের ব্যক্তিগত মান্যতাগুলিকে বেদের উপর প্রতিস্থাপিত করে দিয়েছেন। এইভাবেই সায়ণ, উব্বট, মহীধর আদি বেদের মধ্যে পশুবলি আদিকে দেখিয়েছেন।

আরও একটি সাম্প্রদায়িক উদাহরণ

দৈনিক অগ্নিহোত্রে সায়ংকালীন আহুতির প্রথম মন্ত্র হল—

"অগ্নির্জ্যোতি জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা"

স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দজীর অনুসারে এই মন্ত্রের অগ্নির অর্থ হল কৃষ্ণ এবং জ্যোতির অর্থ হল রাধা। তাঁর মতে কৃষ্ণই রাধা এবং রাধাই কৃষ্ণ।

এইভাবে এটি সুস্পষ্ট যে বেদের ঐতিহাসিক এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বেদের বাস্তবিক অভিপ্রায় থেকে অত্যন্ত পৃথক হয়ে বৈদুষ্য এবং ভাষ্যের এক অরাজকতার মতো স্থিতিতে পৌঁছে গেছে। এমনিতে উব্বট, সায়ণ, মহীধর আদি আচার্য্যদের বেদভাষ্য ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডীয় ইত্যাদি দোষের কারণে বৈজ্ঞানিক ভাষ্যের শ্রেণী স্তর থেকে নীচে চলে গিয়েছে কিন্তু স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দের ভাষ্য তো বেদের অর্থসমূহতে উক্ত নূতনরূপে জুড়ে দিয়ে এ সিদ্ধ করে দিয়েছে যে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক আশঙ্কাপূর্তির জন্য সায়ণ আদি ভাষ্যকার উপসহনীয়রূপে বৈজ্ঞানিক ভাষ্যকর্তার স্তর থেকে পতিত হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দুই প্রকারের ভাষ্যকারদের ভাষ্যগুলির চর্চা করছিলাম। এক প্রকারের ভাষ্যকার তো হলেন আচার্য্য সায়ণ আদি যাঁরা বেদে ইতিহাস, পৌরাণিক গাথা, পশুবধ, গোমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি সমর্থক অনেক অবৈজ্ঞানিক অনার্য পদ্ধতির ভাষ্য করেছেন। উক্ত ভাষ্যকর্তা হলেন বেদভক্ত, বেদকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান স্বীকার করেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের ভাষ্য আজকের বিদ্বৎসমাজে সম্মানীয় হয়ে বেদকে অনেক দোষে পরিপূর্ণ দেখিয়ে চলেছেন।

বৈজ্ঞানিক ভাষ্য

অন্য প্রকারের ভাষ্যকারদের শ্রেণীতে আসেন শ্রীস্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর অনুযায়ীগণ। তাঁরা যাস্ক, যাজ্ঞবল্ক্য আদি ঋষিমুনিদের পথকে অনুসরণ করেন। তাঁদের ভাষ্যগুলিকে অধিক বৈজ্ঞানিক কোটির ভাষ্যরূপে স্বীকার করা হয়। উক্ত ভাষ্যগুলি থেকে বেদকে সম্মান প্রাপ্ত হয়।

ইউরোপীয় ভাষ্য

বেদের অর্থ করার তৃতীয় সমুদায়ও রয়েছে। তাঁরা হলেন সবাই ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানীর ভাষ্যকার। তাঁদের মধ্যে এক-দুজনকে ছেড়ে দিয়ে সবাইয়ের মধ্যে বেদার্থ করার পেছনে কিছু না কিছু নিহিত স্বার্থ ছিল। এইসব বিদ্বানদের ইষ্ট (উদ্দেশ্য) ছিল স্বার্থের উপরে বিদ্যার দৃষ্টিতে কার্য্য করা কম এবং খ্রীষ্টান মতবাদের প্রচার ছিল বেশী।

অষ্টাবিংশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়ের কথা। ইংল্যাণ্ডের খ্রীষ্টানদের মধ্যে সংস্কৃত পড়ার, শোধ করার জোয়ার এসে গিয়েছিল। বিশেষ করে বেদের উপর এতবেশী কাজ হয়েছিল যে দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। খ্রীষ্টান সরকার, খ্রীষ্টান বিদ্বান্ প্রাচ্যবিদ্যার নামে ভারতবাসীদের ধর্ম এবং তাঁদের সংস্কৃতিকে বিকৃত করার নিন্দনীয় ঘৃণিত কার্য্য করছিল। ভারতবাসী ভাবতো যে খ্রীষ্টানবিদ্বানেরা বিদ্যার সেবা করে চলছে। কিন্তু এই বিদ্বানদের বাস্তবিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সম্মানীয় গ্রন্থগুলির এমন দূষিত ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাকে পড়ে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ঘৃণা করবে এবং খ্রীষ্টান মতকে স্বীকার করে নেবে। খ্রীষ্টানধর্মের প্রচার হলে ইংরেজ সাম্রাজ্যের স্থিতি সুদৃঢ় হবে— এই ছিল সংস্কৃত পড়ার পেছনে দূষিত নিহিত স্বার্থ।

ভারতে ইংল্যাণ্ডের খ্রীষ্টান-ব্যবসায়ীদের আগমন হয়ে গিয়েছিল। এখানকার ছোটো-ছোটো রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক কলহকে দেখে তাঁদের মনে এখানে রাজত্ব করার মনোবৃত্তি জেগেছিল। তারা গম্ভীরভঅবে এটা বুঝে নিয়েছিল যে ভারতের ধর্ম এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিকে দূষিত করলে এবং হীন, অবর, নীচ প্রমাণিত করলে তাদের ধার্মিক এবং রাজনৈতিক লাভ হবে। এইভাবে তাঁদের উভয়প্রকারের স্বার্থ সিদ্ধ হয়ে চলেছিল। অতএব প্রাচ্য বিদ্যা (INDOLOGY)-কে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে রূপায়িত করার জন্য তাঁরা যথাসাধ্য প্রযত্ন করেছিল। ইউরোপীয় বিদ্বানদের স্বার্থ এতেও ছিল যে তাঁরা ভারতের ধর্মগ্রন্থ বেদকে নিম্ন স্তরের প্রমাণিত করে দেবে। এই উদ্দেশ্যকেই মনের মধ্যে রেখে ইংল্যাণ্ডে সংস্কৃত এবং বেদের অধ্যয়ন—অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। অক্সফোর্ড হল লণ্ডনের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে কোলোনেল বার্ডেন অক্সফোর্ডে সংস্কৃত-পীঠের স্থাপনা করেন। এই পীঠে সর্বপ্রথম প্রফেসর উইলসনের নিযুক্তি হয়েছিল। উনি Religious and Philosophical system of Hindus নামক একটি পুস্তক লিখেছিলেন। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য কোন বিদ্যার বিস্তার অথবা শোধ বা অন্য কিছু বৈদুষ্যপূর্ণ কার্য করা ছিল না—এই পুস্তকের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্বকে হীন দেখিয়ে খ্রীষ্টানমতের প্রচার। প্রফেসার উইলসন স্বয়ং লিখেছেন—"These lectures were written to help candidates for a prise of £200 given by John Muir, a great sanskrit scholar for the best refutation of the Hindu religious system." অর্থাৎ প্রফেসার উইলসন এটি এইজন্য লিখেছেন যে হিন্দুদের ধার্মিক সিদ্ধান্তগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ খন্ডন লেখার প্রত্যাশীদেরকে দুইশত পাউন্ডের পুরস্কার প্রাপ্ত করার জন্য উৎসাহিত করা যায়।

এই ছিল ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পীঠের স্থাপনার উদ্দেশ্য। এই সংস্কৃত-পীঠের চেয়ারে দ্বিতীয় নিযুক্তি হয়েছিল প্রফেসর মোনিয়র উইলিয়মসের। তিনি একটি সংস্কৃতের প্রসিদ্ধ অভিধান (DICTIONARY) লিখেন—'Sanskrit English Dictionary'—উনি এই অভিধানের ভূমিকাতে সুস্পষ্ট স্বীকার করেছেন—**"I must draw attention to the fact that I am only the second ocupant of the Boden Chair and that its founder, colonel Boden, Stated most explicitly in his will (Dated August 15, 1811 A.D) that the special object of his munificient bequest was to promote the**

translation of scriptures into English, so as to enable his countryman to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion."

মোনিয়র উইলিয়ম লিখেছেন যে আমি এই তথ্যের দিকে ধ্যানাকর্ষণ করানো অতি আবশ্যক মনে করি যে আমি কেবল দ্বিতীয় পীঠাসীন (অধ্যাপক) মাত্র এবং এটা হল যে এই পীঠের সংস্থাপক কোলোনল বোডন মহোদয়ের উদারতাপূর্ণ দানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ভারতের ধর্মগ্রন্থগুলির ইংরাজীতে অনুবাদ করা যাতে দেশবাসী (ইংল্যাণ্ড) ভারতের নিবাসীদেরকে খ্রীষ্টানমতে দীক্ষা দেওয়ার কার্য্যে অগ্রসর হতে পারে।

এইসব বিদ্বানদের সম্পূর্ণ ধ্যান এই দিকে ছিল যে যেনকেন প্রকারেণ ভারতবাসীদেরকে খ্রিস্টান করে দেওয়া যায়। এই প্রফে. মোনিয়র উইলিয়মস্ একটি বই লিখেছিলেন—'The study of sanskrit in relation to missionary work in India (in 1861).

এই পুস্তকে তিনি লিখেছেন—**"When the walls of the mighty fortress of Hinduism are encircled, undermind and finally stormed by the soldiers of the cross, the victory of christianity must be signal and complete."**—এই উক্তিতে তথাকথিত সংস্কৃতের ইংরেজ অধ্যাপক এবং তথাকথিত বিদ্বানদের ধূর্ততাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক উৎকণ্ঠা কতখানি মুখর হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন—"যখন হিন্দুত্বের দুর্গের সুদৃঢ় দেওয়ালকে ঘিরে নিয়ে নির্বল করে দিয়ে শেষরূপে খ্রীষ্টানমতের সিপাইদের দ্বারা তার উপর আক্রমণ করা যাবে তখন খ্রীষ্টানমতের বিজয় পূর্ণতঃ এবং অপূর্ব হবে।"

ইউরোপের বিদ্বানদের মধ্যে মোক্ষমূলরের নাম হল অগ্রগণ্য যেমনভাবে ভারতবর্ষে কমবেশী কিছু বিদ্বানেরা বেদের ভাষ্য করেছেন, কিন্তু আচার্য্য সায়ণ হলেন অগ্রগণ্য। এইভাবে ইউরোপে অনেক বিদ্বানেরা বেদের অনুবাদ আদি করেছেন কিন্তু মোক্ষমূলর প্রথম স্থানে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

মোক্ষমূলর জন্মতঃ জার্মানী ছিলেন। বুদ্ধি ছিল বড় তীব্র, কলমে সুদক্ষ ছিলেন কিন্তু পরিবারসম্পন্ন ছিল না। লর্ড মেকালে এটি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে এই মেধাবী বিদ্বান্ লেখক (মোক্ষমূলর)-কে কিনে নেওয়া যেতে পারে। সেকালে ২৮ ডিসেম্বর ১৮৫৫-র দুর্ভাগ্যপূর্ণ দিনে উক্ত মেধাবী জার্মান বিদ্বান লেখকের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবাতে নিযুক্ত করার জন্য সাক্ষাৎকার (INTERVIEW) নিলেন। নির্ধনতার চাপে পড়ে পীড়িত

মোক্ষমূলর সেকালের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পয়সা এবং সেকালের ধূর্ততাপূর্ণ নীতিমত্তা মোক্ষমূলরের বিদ্যাকে, যোগ্যতাকে, কলমকে দাসত্বে পরিণত করে দিল। মোক্ষমূলর এই সেবাকে স্বীকার তো করে নিলেন কিন্তু এতে প্রসন্নতা না হয়ে দুঃখই হয়েছিল। মোক্ষমূলর দুঃখী-হৃদয়ে লিখেছেন—"I went back to oxford a sadder man and a wiser man"—অর্থাৎ আমি অক্সফোর্ড ফিরে গেলাম তো এক বুদ্ধিমান কিন্তু দুঃখী ব্যক্তি হিসাবে। দুঃখ হয়ে থাকবে নিজের বিদ্যাবুদ্ধিকে বিক্রি করার জন্য এবং বুদ্ধিমত্তা ছিল সংসারে নির্বাহ করার জন্য সেবা করে (বেতন) নেওয়ার জন্য।

মোক্ষমূলর আত্মাকে বিক্রি করলেন। খ্রীষ্টান মিশনের দুর্দমনীয় যোদ্ধা রূপে, নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং লেখনী দিয়ে মিশনের স্বার্থ পূর্ণ করতে লাগলেন। তিনি উচিৎ-অনুচিৎ-র বিচার ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি এবং ধর্মগ্রন্থের আলোচনা, ভ্রান্ত এবং নিজের নিহিত নিকৃষ্ঠ-স্বার্থ মিশনের প্রচারের জন্য মনসা-বাচা-কর্মণা আত্ম-সমর্পণ করে দিলেন। এভাবে তাঁর সারা জীবন, পত্র-ব্যবহার, তাঁর এই ঘৃণিত-গর্হিত স্বার্থের সাক্ষী দিচ্ছে। কিন্তু আমরা এখানে বিস্তার ভয়ের কারণে একটি-দুটি উদাহরণ দিয়ে সুধী পাঠকদেরকে ম্যাক্সমূলরের মানসিকতার পরিচয় এবং উপরিলিখিত নিষ্কর্ষের জ্বলন্ত প্রমাণ দিচ্ছি—

মোক্ষমূলর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজের পত্নীকে একটি পত্রে লিখে স্বীকার করেছেন যে বৈদিক সাহিত্যে তাঁর পরিশ্রমের উদ্দেশ্য হল হিন্দুত্ব এবং হিন্দুধর্মগ্রন্থকে অপমানিত করে তাকে মূল (শিকড়) থেকে সমাপ্ত করা। এই নিকৃষ্ঠ স্বার্থকে মোক্ষমূলরের পত্রেই দেখুন—**"This edition of mine and the translation of the Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India-it is the root of their religion and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last three thousand years."**—এই উদ্ধরণ যে পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম—"Life and letters of Fredrick Maxmuller. এই পুস্তকটিকে মোক্ষমূলরের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী প্রকাশিত করিয়েছিলেন। মোক্ষমূলর লিখেছেন যে আমার বেদের এই সংস্করণ এবং অনুবাদ ভারতের ভাগ্যকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রভাবিত করবে কেননা এটি (বেদ) হল তাঁদের ধর্মের মূল এবং এটি দেখাতে হবে যে 'মূল কি?"—সে সবকে মূল থেকে

সমস্ত করার একটাই রাস্তা যেটা এখানে তিনহাজার বছরে প্লাবিত হয়েছে—এতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।

উক্ত পত্রে মোক্ষমূলর তাঁর দূষিত প্রচার পরিকল্পনা এবং নিজের ঘৃণিত নিকৃষ্ট স্বার্থকে সর্বদা অনাবৃত নগ্নরূপে প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তিনি খ্রীষ্টান মতের প্রচারের জন্য কতখানি অধিক ব্যগ্র ছিলেন—এটি নিম্নপত্রে দর্শনীয়। ডিউক অফ্ আর্গাইল সেই সময় ব্রিটিশ মন্ত্রী মন্ডলে ভারতমন্ত্রী ছিলেন। মোক্ষমূলর ১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৮-তে একটি পত্র লিখেছিলেন—**"The ancient religion of India is doomed and if christianity does not step in, whose fault will it be ?"** অর্থাৎ ভারতের প্রাচীনধর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁর জায়গা খ্রীষ্টানমত নিচ্ছে না—তাহলে এটি কার দোষ হবে?

এতো মাত্র উদ্ধৃতি। এর মূলভাব হল যে মোক্ষমূলর ইত্যাদি বিদ্বানেরা ভারতের প্রাচীন ধর্মকে নষ্ট করে দিয়েছে। এবারে ব্রিটিশ সরকার এখানে খ্রীষ্টানমতের প্রচার করুক।

স্বামী দয়ানন্দের উগ্র বিরোধ

ইংরেজরা মোক্ষমূলরের সংস্কৃত এবং বেদজ্ঞান তথা ইউরোপের বিদ্বানবর্গের সংস্কৃত জ্ঞান এবং বিদ্যাকে বাড়িয়ে-চড়িয়ে ভারতবর্ষে প্রচার করেছিল। মোক্ষমূলর স্বয়ং-ই নিজের কোনো একটি গ্রন্থে নিজের নাম "মোক্ষমূলর ভট্ট" প্রকাশিত করেছিলেন। এটি ভারতীয় ভাবনা এবং রুচির থেকে বেশী মিল খেয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ স্বয়ং-ই ১৮৭৩তে কোলকাতা থেকে নদীয়া শান্তিপুরের সংস্কৃত কেন্দ্রের পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। স্বামীজীর হৃষ্ট-পুষ্ট স্বস্থ শরীর, উচ্চ শরীর, স্বর্নিম বর্ণ, ভব্য ললাট, আকর্ষকরূপ দেখে কিছু লোক গণ্ডগোল শুরু করে দিয়েছিল যে প্রসিদ্ধ জার্মান বিদ্বান্ মোক্ষমূলর এসেছেন। স্বামী দয়ানন্দ এই প্রকারের ইংরেজদের এবং ইংরেজ শাসনের দুরভিসন্ধিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যানে এবং গ্রন্থগুলিতে স্বামীজী এই দুরভিসন্ধি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। নিজের যুগান্তকারী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশের একাদশ সমুল্লাসে স্বামীজী সবল এবং সুস্পষ্ট শব্দে সামান্যতঃ ইউরোপের বিদ্বান্ বিশেষতঃ মোক্ষমূলরের অল্প সংস্কৃত জ্ঞানের সম্বন্ধে লিখেছেন—"এবং যতসব বিদ্যা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে, সেসব আর্যাবর্ত দেশ থেকে মিশর, মিশর থেকে ইউনানী, তার

থেকে রোম এবং তার থেকে ইউরোপ দেশে, তার থেকে আমেরিকা আদি দেশে ছড়িয়েছে। এত পর্য্যন্ত যত প্রচার সংস্কৃত বিদ্যার আর্যাবর্তদেশে আছে, তত অন্য কোনো দেশে নাই। যে সব লোকেরা বলেন যে জার্মান দেশে সংস্কৃতবিদ্যার অনেক প্রচার আছে এবং যতটুকু সংস্কৃত মোক্ষমূলর সাহেব পড়েছেন অতটা কেউ পড়ে নাই, এটি হল কথার কথা। কারণ "যস্মিন্ দেশে দ্রুমোনাস্তি তত্রৈরণ্ডোঽপিদ্রুমায়তে"—অর্থাৎ যে দেশে কোনো বৃক্ষ হয় না, সেই দেশে ঐরণ্ড (ভেঁড়রাগাছ)-কে বড় বৃক্ষ মেনে নেওয়া হয়। ঠিক সেইরকম ইউরোপ দেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রচার না হওয়ায় জার্মান এবং মোক্ষমূলর সাহেব একটুখানি পড়েছেন, সেটাই সেই দেশের কাছে সর্বাধিক। পরন্তু আর্যাবর্ত দেশকে দেখুন তো তাঁর অনেক কম গণনা হয়। কেননা আমি জার্মান দেশবাসীর (একজন প্রিন্সিপ্যালের) পত্র থেকে জেনেছি যে জার্মান দেশে সংস্কৃত পত্রের অর্থ বলার লোক অনেক কম। এবং মোক্ষমূলর সাহেবের সংস্কৃত সাহিত্য এবং অল্প একটু বেদের ব্যাখ্যা দেখে আমার মনে হয় মোক্ষমূলর সাহেব এদিক-সেদিক আর্যাবর্তীয় লোকেদের দ্বারা লেখা টীকা দেখে কিছু যথা তথা লিখেছেন।"

এইসব ইউরোপীয় বিদ্বানদের গ্রন্থগুলিকে আধার করে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত, বেদ এবং প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যয়ন— অধ্যাপন ইংরেজী রাজ্যে হত এবং ৫০ বছরের স্বতন্ত্রতার কালেও কিছু মহত্ত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় নাই। আজও ভারত এবং ভারতীয়তা, রাষ্ট্রীয় একতার সাংস্কৃতিক পক্ষের উপজীব্য এই নিকৃষ্ট স্বার্থে পরিপূর্ণ পশ্চিমী বিদ্বানদের দ্বারা প্রণীত প্রাচ্যবিদ্যা (INDOLOGY) তৈরি হয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ইতিহাসের বিদ্বান্ হোক অথবা প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ (INDOLOGISTS), সংস্কৃতের বিদ্বান্ হোক অথবা অদ্যতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেদোপাধ্যায় মহানুভাব, সামান্যতঃ সবাইয়ের বেদবিদ্যা, বেদার্থের প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত থেকে পল্লবগ্রাহী পরিচয়ই হয়। অতঃ বেদকে বোঝার জন্য কোনো পূর্ববর্তী বিদ্বানবর্গের ভাষ্যের অনুবাদের আশ্রয় নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়।

বেদের ভাষ্য

বেদের অনুবাদকর্তাদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ভারতীয় ঋষি, মুনি, বিদ্বানগণ। তাঁরা প্রায় সবাই ভাষ্যকার। দ্বিতীয়তঃ

বিদেশী বিদ্বান যাঁরা ভাষ্যকার তো কম, অনুবাদক অধিক, কখনও কখনও ইংরেজীতে পদ্যানুবাদও করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষ্যকার বেদকে অপৌরুষের, ঈশ্বরপ্রেরিত প্রদত্তকৃত মেনে থাকেন। স্বামী দয়ানন্দ বেদকে অপৌরুষের ঈশ্বরকৃত স্বীকার করেন। বেদ হল ঈশ্বরকৃত—এর জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ তো প্রচুর মাত্রাতে উপলব্ধ হয় কিন্তু যাঁরা বেদকে ঈশ্বরকৃত স্বীকার করেন না তাঁদের জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণও ব্যর্থ। তাঁদের জন্য তো তর্ক-ই প্রমাণ সম্ভব। স্বামী দয়ানন্দজী 'বেদ ঈশ্বরকৃত'—এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশে এইভাবে লিখেছেন—

"প্রশ্ন ঃ—বেদ হল ঈশ্বরকৃত, অন্যকৃত নয়, এতে প্রমাণ কি রয়েছে?"

উত্তর ঃ—(১) যেমনকি ঈশ্বরের পবিত্র, সর্ববিদ্যাবিৎ, শুদ্ধগুণকর্ম স্বভাব, ন্যায়কারী, দয়ালু আদি গুণযুক্ত তেমনি যে পুস্তকে ঈশ্বরের গুণ, কর্ম, স্বভাবের অনুকূল কথনও রয়েছে তা হল ঈশ্বরকৃত অন্য কোন নয়।

(২) এবং যাতে সৃষ্টিক্রম, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, আপ্ত এবং পবিত্রাত্মার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কথনও না হয় তা হল ঈশ্বরকৃত।

(৩) যেমনটি ঈশ্বরের নির্ভ্রম জ্ঞান তেমনটি যে পুস্তকে ভ্রান্তিরহিত জ্ঞানের প্রতিপাদন হয়, তা হবে ঈশ্বরকৃত।

(৪) যেমন পরমেশ্বর সৃষ্টিক্রম রেখেছেন তেমনিই ঈশ্বর, সৃষ্টি, কার্য্য, কারণ এবং জীবাত্মার প্রতিপাদন যাতে হবে, তা হল পরমেশ্বরোক্ত পুস্তক।

(৫) আর যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিষয়গুলি থেকে অবিরুদ্ধ, শুদ্ধাত্মার স্বভাব থেকে বিরুদ্ধ না হয়।

এইজন্য কেবল বেদই ঈশ্বরকৃত—অন্য বাইবেল, কুরান আদি নয়।

পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে মনুষ্যদের জীবনকে সুচারুরূপে চালানোর জন্য যেমন জল, অন্ন, বায়ু আদি দিয়েছেন তেমনিই প্রভু বেদজ্ঞানও দিয়েছেন। প্রফেসার মোক্ষমূলর তাঁর পুস্তক 'Science and Religion'-এ নিম্নপ্রকার লিখেছেন—**"If there is a god who has created heaven and earth, it will be unjust in his part if he deprives millions of his sons born before moses, of his divine knowledge. Reason and comparative study of religions declares that god gives his knowledge from his first appearance on earth."**

অর্থাৎ যদি কোনো ঈশ্বর থাকেন যিনি ধরিত্রী, আকাশের নির্মাণ করেছেন তাহলে তাঁর কাছে এটা অন্যায়পূর্ণ হবে যে, তিনি মূসার পূর্বে উৎপন্ন নিজের কোটি কোটি পুত্র-সন্তানদেরকে তাঁর নিজের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রাখবেন।

তর্ক এবং ধর্মের তুলনাত্মক অধ্যয়ন উক্ত দুইটি বিষয় বলছে যে মনুষ্যের উৎপত্তির সাথে সাথে প্রভু তাঁর নিজের দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন।

স্বামী দয়ানন্দজীর বেদসম্বন্ধী সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমের বিদ্বানদিগকে একটি নূতন দৃষ্টিকোণ প্রাপ্ত হয়। জেমস্ হেস্টিংস তাঁর নিজের গ্রন্থ Encyclopaedia of Religion and Ethics-এ লিখেছেন— **"Dayanand tried to prove the Book of god resemble the book of nature."** অর্থাৎ স্বামী দয়ানন্দ ঈশ্বরীয় পুস্তক বেদ এবং প্রকৃতির পুস্তক সৃষ্টির মধ্যে একরূপতা দেখানোর প্রয়াস করেছেন।

স্বামী দয়ানন্দ বৈদিক ধর্মকে রুচিবাদ, অন্ধবিশ্বাস, (Miracle) আদি থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ বুদ্ধি তর্ক এবং দর্শনের আধার প্রদান করেছেন। ইংল্যাণ্ডের মনীষী চিন্তক W. D. Brown বৈদিক ধর্মের এই বিশেষতাকে তাঁর নিজের পুস্তক "Superiority of Vedic Religion"—এ নিম্নভাব ব্যক্ত করেছেন—**"Vedic Religion is thoroughly scientific where science and religion meet hand in hand. Here theology is based on science and philosophy."**—অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম হল পূর্ণতঃ বৈজ্ঞানিক। এখানে ধর্ম এবং বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য রয়েছে। এখানে ধর্মের আধার হল বিজ্ঞান এবং দর্শন।

স্বামী দয়ানন্দ বেদকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসংগত আধারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানে বেদ কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডেরই গ্রন্থ রইল না। সংসারের বিদ্বান বেদকে সব সত্যবিদ্যার পুস্তক বুঝে নেওয়ার জন্য গম্ভীরতাপূর্বক বিচার করতে শুরু করেছেন স্বামী দয়ানন্দের দ্বারা প্রচারিত কিছু আধারভূত মান্যতা নিম্নপ্রকার—

(১) বেদজ্ঞান হল পরমেশ্বর প্রদত্ত—যজু. ৩১-৭, অথর্ব ১০-২০

(২) বেদকে সৃষ্টির আদিতে চার ঋষির দ্বারা পরমেশ্বর প্রকট করেছেন।

(৩) বেদের কল্যানীবাণী মনুষ্যমাত্রের জন্য ; কোনো বিশেষ জাতি, বর্ণ, দেশ বা রাষ্ট্র বা কোনো সমুদায়ের জন্য নয়। অতঃ বেদ হল বিশ্বজনীন।

বেদ ভাষ্যের নির্দেশক তত্ত্ব

এই দৃষ্টি থেকে বেদভাষ্যের নিম্ন নির্দেশক তত্ত্বকে মনে রাখা আবশ্যক—

(১) বেদের শব্দগুলির প্রকৃতি যৌগিক হবে ঃ সামান্যতঃ শব্দকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়—যৌগিক, যোগরূঢ়ি, রূঢ়ি। যৌগিক শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়

থেকে তৈরি হয়। যেমন—পঠ্ ধাতু থেকে পাঠক বা লিখ্ ধাতু থেকে লেখক বা জলজ (জলে জন্ম নেয় আদি)। যোগরূঢ়ি হল সেইসব শব্দ সেটা মূলতঃ তো যৌগিক কিন্তু কোনো বিশেষ অর্থে রূঢ় হয়ে যায়। যেমন জলজ শব্দের যৌগিক অর্থ হল "জলে যে জন্ম নেয়"। কিন্তু কমল, শৈবাল, অনেক প্রকারের পোকামাকড় বনস্পতি সবাই জলে জন্ম নেয় কিন্তু জলজ শব্দের যোগরূঢ় অর্থ হল কমল। কোন শব্দকে যোগরূঢ় হওয়ার জন্য কিছু সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। পরম্পরা যে কোনো অর্থে শব্দকে কিছু সময়ে যোগরূঢ় করে দেয়। বেদে যৌগিক শব্দ অধিক, যোগরূঢ় কম হবে। শুদ্ধ রূঢ় যেমন শালা, মালা, সুতা, খড়ম আদির প্রয়োগ তো কিছু সময় পরেই সম্ভব। অতঃ বেদে রূঢ়ি শব্দ নেই।

(২) **বেদ হল সব সত্যবিদ্যার পুস্তক ঃ** পরমেশ্বর নামরূপাত্মক জগৎকে সৃষ্টি করেছেন এবং শ্রবণীয়-পঠনীয় বেদ সৃষ্টি করেছেন। জগৎ হল প্রভুর দৃশ্য কাব্য এবং বেদ হল শ্রাব্যকাব্য, শ্রুতি। যেমন জগতে রয়েছে তেমনটি বেদেও রয়েছে। পরমেশ্বরের দেওয়া জ্ঞানে সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ কিছুই হওয়া উচিৎ নয়। যিনি স্রষ্টা তিনি সৃষ্টি-নির্মাণ করেছেন, সেই বিধাতা বেদের জ্ঞান দিয়েছেন। অতঃ বেদের উপলব্ধ জ্ঞান তথা সৃষ্টির উপলব্ধতা-ব্যবস্থাতে একরূপতা রয়েছে।

(৩) **বেদার্থে অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ তিনটিই রয়েছে ঃ** বহু বহু বিদ্বান্‌গণ বেদ মন্ত্রের উপযোগিতা কেবল যজ্ঞের জন্যই স্বীকার করেছেন, মেনেছেন। বস্তুতঃ আর্য্য পরম্পরা ভাষ্যকার, নিরুক্তের আচার্য্য যাস্ক আদি বেদার্থকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিযাজ্ঞিক স্বীকার করেন। স্বামী দয়ানন্দও বেদার্থ বিষয়ে উক্ত তিন প্রক্রিয়াকে স্বীকার করেন।

(৪) **বেদে ইতিহাস নেই ঃ** ইতিহাস শব্দের অর্থই হল—'ইতি + হ + আস'—এটি এইরকম ছিল। ইতিহাস হল কোনো ব্যক্তির, ঋষির, রাজার, দেশের। কোনো ব্যক্তি অথবা ঘটনা কখনও হয়েছে, কিছুদিন পরে সেই ব্যক্তির অথবা ঘটনার বর্ণনা ইতিহাস হয়ে যায়। যখন বেদ সৃষ্টির আদিতে হয়েছে তো তাতে কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার ইতিহাস সম্ভবই নয়। অতঃ বেদার্থ ইতিহাসপূরক হতেই পারে না।

বস্তুতঃ বেদে কশ্যপ, কণ্ব, জমদগ্নি ইত্যাদি ঋষিনাম ; কৃষ্ণ, অর্জুনের মতো ব্যক্তি নাম ; গঙ্গা-যমুনার মতো নদী-নাম, অযোধ্যার মতো নগরের নাম পাওয়া যায়। অতঃ সাধারণ দৃষ্টিতে এইরকম মনে হয় যে এই সব

ইতিহাস বা ভূগোলেরই বর্ণনা হবে। এর অর্থ এইটা হবে যে এইসব কশ্যপ, কৃষ্ণ আদি ব্যক্তি এবং অযোধ্যা আদি নগর পূর্বে ছিল এবং পুনঃ পেছন থেকে বেদের মধ্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বেদ কৃষ্ণ, অর্জুন মহাভারতের (৫০০০ বৎসর) পরেই হয়েছে। বস্তুতঃ কথাটা বিপরীত। বেদে নামসমূহকে দেখে পরবর্তীকালে ব্যক্তির, বস্তুর, নদীর, নগরের নামকরণ হয়েছে।

মনুস্মৃতিতে একটি শ্লোক রয়েছে—

"সর্বেষাংতু নামানি কর্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্মমে॥ (১-২১)

এর অর্থ হল যে সংসারের পদার্থের নাম, কার্য্য ব্যবহার সবাইয়ের নির্মাণ বেদের শব্দসমূহ দিয়েই করা হয়েছে। উদাহরণার্থ বেদে অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা আছে—

"অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরযোধ্যা" (অথর্ব-১০-২-৩১)

—অর্থাৎ অযোধ্যা হল আট চক্র এবং নয়টি দ্বারের দেবতাদের নগরী। অযোধ্যা শব্দের অর্থ হল—'ন যোদ্ধুং শক্যা'—যে নগরের উপর শত্রু যুদ্ধ করতে সমর্থ-ই না হয়। এটি অত্যন্ত বুদ্ধিসংগত ইক্ষ্বাকুবংশীরা বেদে অযোধ্যা নগরীর নাম দেখেছিলেন এবং যখন তাঁর তাঁদের রাজধানী সরয়ূ নদীর তটে তৈরি করলেন তখন তাঁরা নগরীর নাম অযোধ্যা রেখে দিয়েছিলেন। বেদে তো প্রথমেই অযোধ্যার নাম অঙ্কিত ছিল, তাকেই দেখে সবাইয়ের নামকরণ করে দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ বেদে কোনো ব্যক্তি, নগর, নদীর নাম, ইতিহাস কিছুই নাই। এগুলি সব যোগিক শব্দ। মন্ত্রে এর সন্দর্ভও ইতিহাসপরক নয়।

বেদে কৃষ্ণ, অর্জুন, শিব, বিষ্ণু, কণ্ব আদি এইরকম অনেক পদ দেখতে পাওয়া যায়—মনে হয় কোনো ব্যক্তির নাম কিন্তু একটুখানি মন লাগিয়ে বিচার করলে প্রতীত হবে যে এসব ব্যক্তির নাম নয়—এ তো বিশেষণ (ADJECTIVE)। এই ধরণের শব্দ সমূহের সাথে 'তরপ্' এবং 'তমপ্' প্রত্যয়ের প্রয়োগ বেদে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কণ্ব শব্দ। নিঘন্টুতে 'কণ্ব মেধাবিনাম্সু পঠিতম্' দেওয়া আছে। অর্থাৎ কণ্বশব্দের অর্থ হল মেধাবী। বেদে 'কণ্বতমঃ" পাঠ উপলব্ধ হয়। অতএব, কণ্বশব্দ মেধাবী অর্থে বিশেষণই হতে পারে, কারও নাম নয়। যেমন ভোজ এক রাজার নাম ছিল। এখন কেউ ভোজতরঃ বা ভোজতমঃ লিখবে না, হ্যাঁ, সুন্দরতর বা সুন্দরতম

প্রয়োগ তো হয়েই থাকে। অতঃ কণ্বের মত পদ হল বিশেষণ, বিশেষ্য নয়। এই নিয়ম সমস্ত সংজ্ঞা (NOUN) শব্দের সঙ্গে যুক্ত।

এইভাবেই নমস্কার মন্ত্রে 'নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভায় চ' এবং পাঠ রয়েছে 'নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ'। এখানে 'শিবতর' প্রয়োগ ডেকে ডেকে বলছে যে শিব শব্দ বিশেষণ, বিশেষ্য নয়। এখন এতে কৈলাশপতি নিবাসী, পার্বতীর পতি, গণেশের পিতা, কোনোও ব্যক্তিবিশেষের বর্ণনাকে স্বীকার করা, এই ধরণের মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে ইতিহাস্পরক অর্থ করা সর্বদা অন্যায়।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে কৃষ্ণ এবং অর্জুন—দুইটিই শব্দ এসেছে।

"অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জুনং চ বিবর্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ" ৬-৯-১

এখানে কৃষ্ণং অহঃ, অর্থাৎ দিনের কালাভাগ মনে করো রাত্রি এবং অর্জুনং অহঃ, দিনের শুক্লভাগ অর্থাৎ দিন, রজসী-ভূমি এবং দ্যৌ এ বর্তমান রয়েছে। এখন যদি ইতিহাস প্রীতির কারণে মহাভারতকালের কৃষ্ণ এবং অর্জুনের কল্পনা বেদে করা হয় তাহলে বেদ এবং ইতিহাস দুটোরই সাথে ভীষণ অন্যায় হবে। ঋগ্বেদই নয়, চারবেদ সত্য যুগে ও ত্রেতাতে ছিল, শ্রীরাম, হনুমানকে চারবেদের বিদ্বান বলেছেন—

যখন হনুমান সুগ্রীবের দূত হয়ে কিষ্কিন্ধাতে শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় নিতে গেলেন এবং হনুমান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বার্তা করে সুগ্রীবের কাছে ফিরে এলেন তখন শ্রীরাম লক্ষণকে বলেছিলেন—

"নানৃগ্বেদঃ বিনীতস্য নাযজুর্বেদ ধারিণঃ।
নাসামবেদ বিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥ কিষ্কিন্ধা কাণ্ড ৩।২৮

অর্থাৎ যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ না পড়েছে সে এই ধরনের বার্তালাপ করতে পারে না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে বেদ তো মহাভারতের পূর্বেও সত্যযুগে, ত্রেতাযুগেও ছিল। অতএব বেদে ইতিহাস বলা ভীষণ ভুল।

প্রাচীন আচার্য্য বেদে ইতিহাস কখনই মানতেন না। বেদে ইতিহাস মেনে নিলে বেদ অনিত্য হয়ে যাবে। বেদ যদি অপৌরুষেয় হয়, পরমেশ্বরের বাণী হয় তবে তাতে মানব ইতিহাস হতেই পারে না। বেদে ইতিহাসের অবধারণা সাম্প্রদায়িক মান্যতাগুলি থেকে আরম্ভ হয়েছে। শবর স্বামী হলেন পুরাতন ভাষ্যকার। তিনি লিখেছেন—

'ইতিহাস বচনমিদং প্রতিভাতি, ইতিহাসে চ বিধ্বৌসতি আদিমত্তাদোষো বেদে প্রসজ্যতে॥"—অর্থাৎ এটি ইতিহাসের কথা মনে হচ্ছে কিন্তু ইতিহাসের

বিধান হওয়ার ফলে দোষ আসবে যে বেদের আদি (Begining) আছে—ঐসব কোনো সময়ে আরম্ভ হয়েছে।

স্কন্দস্বামী বিক্রমাদিত্যের সপ্ত শতাব্দীতে হয়েছেন। উনি ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের কিছু সুক্তের আধিযাজ্ঞিক (কর্মকান্ডপরক) ভাষ্য করেছেন। ইনি আচার্য্য সায়ণ থেকে ১০০০ বর্ষের পূর্বে ছিলেন। স্কন্দস্বামী তাঁর নিজের নিরুক্ত টীকাতে লিখেছেন—

"এবমাখ্যান স্বরূপাণাং মন্ত্রাণাং যজমানে নিত্যেষু পদার্থেষু যোজনা কর্তব্যা। এষু শাস্ত্রে সিদ্ধান্তঃ।"—অর্থাৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হল যে যেখানে মন্ত্রসমূহতে আখ্যানের রূপ দেখা দেয়, তাকে নিত্য পদার্থের বর্ণনার প্রসঙ্গ মনে করো।

আচার্য্য বররুচি হলেন স্কন্দস্বামীর থেকেও প্রাচীন। তিনি তাঁর গ্রন্থ নিরুক্ত সমুচ্চয়ে লিখেছেন—**"ঔপচারিকোঽয়ং মন্ত্রেষ্বাখ্যান সময়ো নিত্যত্ব বিরোধাৎ। পরমার্থেন তু নিত্য পক্ষ এব ইতি নৈরুক্তাঃ।"**

ভাবার্থ হল যে, মন্ত্রসমূহতে আখ্যান হল ঔপচারিক কেন না আখ্যান হওয়াতে বেদের নিত্যতার বিরোধ হয়ে যায়।

অতএব বেদে কৃষ্ণ-অর্জুন বা কোনো অন্য ব্যক্তির ইতিহাস অন্বেষণ করা ভীষণ ভুল হবে।

এই ধরনের প্রসঙ্গ নদীগুলির সম্বন্ধেও আসে। ঋগ্বেদের একটিই মন্ত্রে দশটি নদীর নাম এসেছে। এখানেও গঙ্গা, যমুনা আদি শব্দ তো আছেই, কিন্তু এগুলি নদীর নাম নয়। ঐসব শব্দ হল যৌগিক এবং মনুষ্যের আন্তরিক স্থিতির বর্ণনা করে। ঋগ্বেদের মন্ত্রটি হল নিম্নপ্রকার—

'ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতী শুতুদ্রি স্তোমং সচতা

পরুষ্ণ্যা অসিক্ন্যা মরুদবৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণু হ্যা সুসোময়া॥ (১০-৭৫-৫)—উক্ত মন্ত্রে যত শব্দ, গঙ্গা-যমুনা আদি নদীর নাম জানা যাচ্ছে—সেগুলি সব যৌগিক এবং এদের ব্যাখ্যাতে এই মানবশরীরে অবস্থিত বিভিন্ন প্রবাহের বর্ণনা উপলব্ধ হয়। দেখুন—

(১) গঙ্গা = গমনাৎ গঙ্গা—সতত প্রবাহশীল ধী-প্রজ্ঞা

(২) যমুনা = যমনাৎ, সংযমনাৎ যমুনা—মনের চিতিশক্তি

(৩) সরস্বতী = সরস্বতী বাঙ্ নাম, সরস্বতী হল বাণী

(৪) শুতুদ্রী = শীঘ্র দ্রবিত হয়, অন্তঃকরণের প্রেরণা
(৫) পরুষ্ণী = অন্নময়-প্রাণময় আদি পঞ্চকোষকে পূর্ণ করা আত্মজ্যোতি
(৬) মরুৎবৃধা = মরুৎ হল প্রাণ, জীবনজ্যোতি, আমাদের প্রাণশক্তিকে বৃদ্ধি করা ধারা
(৭) আর্জীকীয়া = ঋজু-অকুটিল প্রবাহ, সরলতা, ঋজুতা, আর্জাবম্, সরল জীবন প্রবাহ
(৮) অসিক্নী = মলরহিত, নির্মল জীবন প্রবাহ
(৯) বিতস্তা = শান্ত, দাহরহিত, শান্তিময় জীবনধারা
(১০) সুসোমা = সুসৌম্য ভাবযুক্ত জীবনের ধারা

যখন আমরা বেদে ইতিহাস বা নদী বা নগর ইত্যাদির নামের কথা বলে থাকি তখন একটি প্রশ্ন সহজভাবে সামনে আসে। এসব নাম তো ভারতের ইতিহাস বা ভূগোলের। সমস্যা হল যে পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রের জন্য বেদের জ্ঞান দিয়েছেন তখন সম্পূর্ণ বিশ্বের সমস্ত দেশের জন্য হল বেদ তাহলে এতে কোনো এক দেশ যেমন ভারতের ঋষি, রাজা, নগর, নদী ইত্যাদির নামেরই কেন বর্ণনা রয়েছে? যদি ভারতের নাম রয়েছে তাহলে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা আদি দেশের নামও কেন নাই? বস্তুতঃ ব্যাপারটা হল যে ভারতীয়রা এইসব নামকে বেদে দেখে দেখে তাঁদের নিজের দেশে রেখেছে। এখানকার লোক বেদের সম্পর্কে ছিল এবং বেদ থেকে বেছে বেছেই এঁরা নিজেদের নামকরণ করেছে। অন্য দেশের লোকেদের বেদের সাথে সম্পর্ক ছিল না, তাঁরা এইসব নামের সম্বন্ধে জানতই না, অতঃ ঐ সব নাম রাখবে তো কি করে রাখবে? বস্তুতঃ বেদে, সংহিতাতে কোনো দেশের ইতিহাস বা ভূগোল, ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক কোনো নাম নেই। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণগ্রন্থে ইতিহাস ভূগোল সবই আছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইতিহাস

বেদের আবির্ভাবের পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত লোক বেদকে বেদের সহায়তা নিয়েই পড়তো। সৃষ্টির সেই আরম্ভিক কালে লোকেদের বুদ্ধি অত্যন্ত তীব্র ছিল। তাঁরা বেদকে বিনা কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থের সহায়তা নিয়ে পড়তে পারতো, বুঝতে পারতো। পরবর্তীকালে ব্যাখ্যান গ্রন্থেরও আবশ্যকতা দেখা দিল। নিম্ন উদাহরণ দেখুন—

"সাক্ষাৎ কৃত ধর্মাণো ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃত ধর্মেভ্য

উপদেশেন মন্ত্রান্ সংপ্রাদুঃ। **উপদেশায়গ্লা যন্তোহবরে বিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্ন-সিষুর্বেদং চ বেদাঙ্গানি চ"**—অর্থাৎ আরম্ভে ধর্মের সাক্ষাৎকারী ঋষিগণ হয়েছিলেন। তাঁরা অসাক্ষাৎকর্তা মনুষ্যদের জন্য বেদের উপদেশ দিলেন। পরে যখন স্তর আরও নীচে নেমে গেল তখন বেদকে বোঝার জন্য নিঘন্টু, নিরুক্ত, বেদাঙ্গ আদি গ্রন্থের উপদেশ করা হয়েছিল। সেই ক্রমে বেদের ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরও প্রণয়ন হল। এইভাবে ব্রাহ্মণগ্রন্থ কিছুকাল পশ্চাৎ লেখা হয়েছিল। অতঃ তাতে ইতিহাস আছে।

কাত্যায়ন তাঁর পরিভাষাসমূহের মধ্যে একটি পরিভাষা লিখেছেন—"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্"—অর্থাৎ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ-র নাম হল বেদ। সেই হেতু বেদে ব্রাহ্মণগ্রন্থকে সম্মিলিত মেনে নেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থ তো কালান্তরে লেখা হয়েছে, তখন পর্যন্ত অনেক অনেক রাজা, অনেক অনেক ঋষির কখনও কোনো রাজার অথবা অন্য কোনো নাম-স্থান-ইতিহাস ইত্যাদির বর্ণনা হতেই পারে। এখন ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহে উপলব্ধ ইতিহাসকে বেদের সংহিতাতে বলপূর্বক মেনে নেওয়া বিদ্যার দৃষ্টিতে সর্বদা ভ্রমই নয়, অনুচিৎও বটে। অতঃ বাস্তবিকতা হল এটাই যে বেদে (যাকে সংহিতা বলা হয়) ইতিহাস নেই।

বেদ এবং বিনিয়োগ

স্বামী দয়ানন্দ বেদের সম্বন্ধে প্রচলিত অনেক ভ্রম/বিশ্বাস, ঐতিহাসিক ভুল, ঋষিদের মান্যতার বিপরীত ভাষ্যগুলিতে ভুলের নিরাকরণ করেছেন। বেদভাষ্যের সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য আদি মধ্যকালের ভাষ্যকর্তা আচার্যগণের মন্ত্রের বিনিয়োগের প্রসঙ্গে ভুল করে গেছেন। আচার্য্য সায়ণ, আচার্য্য উব্বট, আচার্য্য মহীধর আদি বিনিয়োগের আধারে মন্ত্রের অর্থ করেছেন। বেদে এসেছে মন্ত্রের মধ্যে পদ-পদার্থ, দেবতা আদির বিচার করে অর্থ করাটা সমীচীন হবে। কিন্তু এইসব মধ্যকালীন আচার্য্যেরা তাঁদের সময়ে প্রচলিত বিনিয়োগের আধারে মন্ত্রের অর্থ করেছেন। এটার অর্থ হল যে, এইসব আচার্যেরা মন্ত্রের পদপদার্থ, সন্দর্ভ আদি সবার উপেক্ষা করে মন্ত্রার্থকে বিনিয়োগের অনুসারে ভাষ্য করেছেন। এখন এটা দেখা দরকার যে বিনিয়োগ ব্যাপারটা কি এবং কিভাবে মন্ত্রের অর্থকে প্রভাবিত করে।

বিনিয়োগ কি?

বিনিয়োগ শব্দটিতে রয়েছে বি + নি + যোগ। যোগ শব্দের অর্থ হল যুক্ত

হওয়া, জুড়ে দেওয়া, মিলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি (যুজির যোগে ধাতু)। বি এবং নি দুটোই উপসর্গ। বি-র অর্থ হল বিশেষরূপে এবং নি-র অর্থ হল নিশ্চিতরূপে। অতএব কোনো মন্ত্রকে কোনো কার্যে, কোনো কর্মকান্ডে বিশেষ প্রকারে নিশ্চিতরূপে যুক্ত করে নেওয়া, সেই মন্ত্রের সেই কর্মকান্ডে বিনিয়োগ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ আর্য্য পরম্পরাতে ১৬টি সংস্কারের মধ্যে কর্ণবেধ সংস্কার হল একটি। এই কর্ণবেধ সংস্কারে শিশুর কানের নীচের ভাগের পাতাতে ফুঁড়ে দেওয়া হয়। তাতে ছিদ্র করা হয়। যখন কানে ছিদ্র করা হয় তখন নিম্নমন্ত্রের পাঠ করা হয়—"ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভিঃ যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাং সস্তনুভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥ (যজু ২৫-২১)—তাৎপর্য হল যে "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম" এই মন্ত্রের বিনিয়োগ কর্ণবেধ নামক সংস্কারে হয়েছে। অতঃ বিনিয়োগের অর্থ হল—কোনো সংস্কারে, কোনো যজ্ঞকার্য্যে, কোনো অবসরবিশেষে কোনো মন্ত্রের পাঠ করা বা সেই মন্ত্রকে পড়ে কোনো কর্মকান্ড করা বা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া।

মধ্যকালীন আচার্য্যদের মত

সায়ণাচার্য্য আদি মধ্যকালীন আচার্য্যদের মান্যতা হল যে, মন্ত্রের ভাষ্য বা অর্থ তাঁর বিনিয়োগের অনুসারে করা উচিৎ। অতঃ এইসব আচার্য্যদের সিদ্ধান্ত হল যে অর্থ বা ভাষ্যকে মন্ত্রের বিনিয়োগের অনুগামী হওয়া উচিৎ।

স্বামী দয়ানন্দের মত

স্বামী দয়ানন্দ বলেছেন যে, মন্ত্রার্থকে বিনিয়োগ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে প্রকরণ-প্রসঙ্গ পদ-পদার্থের অনুকূল করা উচিৎ। এঁর অর্থ হল যে মন্ত্রার্থ তাঁর নিজের সন্দর্ভে বিনিয়োগ থেকে স্বতন্ত্র এবং বিনিয়োগ মন্ত্রার্থের অনুগামী হোক।

মধ্যকালের আচার্য্যদের মতে বিনিয়োগ হল স্বতন্ত্র এবং মন্ত্রার্থকে বিনিয়োগের পেছনে চালানো উচিৎ। স্বামী দয়ানন্দের মান্যতা হল যে মন্ত্রার্থ তার নিজের সন্দর্ভ পদ পদার্থের অনুসারে স্বতন্ত্র থাকা উচিৎ এবং বিনিয়োগ মন্ত্রার্থের, মন্ত্রসমূহের অর্থের ভাবনার অনুকূল হওয়া উচিৎ অর্থাৎ বিনিয়োগকে মন্ত্রার্থের অনুগামী হওয়া উচিৎ, মন্ত্রের অর্থের পেছনে চলা উচিৎ।

কর্ণবেধ সংস্কারে "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম" ইত্যাদির বিনিয়োগ এইজন্য হয়েছে যে এই মন্ত্রাংশের অর্থ হল আমরা (কর্ণেভিঃ) কানের দ্বারা যেন

ভদ্র শুনি (শৃণুয়াম) কিন্তু ভুলটি তখনই হবে যখন আমাদের ভাষ্যকার এইরকম বলতে থাকবে যে এই মন্ত্রটি কেবলমাত্র কর্ণবেধের জন্যই। মন্ত্রে আরও অনেক কিছু রয়েছে।

মন্ত্রটির পুরা অর্থ হল এইরকম—হে যজত্রা দেবাঃ। হে যজনীয়, সৎকরণীয়, দিব্যগুণ বিশিষ্ট পরমেশ্বর। আমরা যেন কানের দ্বারা ভদ্র শুনি, চোখের দ্বারা ভদ্র কল্যাণকারীই দেখি, আমরা যেন সুদৃঢ় সুস্থ অঙ্গ দিয়ে আপনার স্তুতি করতে করতে পূর্ণ আয়ুকে প্রাপ্ত করি। এই মন্ত্রে কান দিয়ে ভদ্র শোনার, চোখ দিয়ে ভালো দেখার এবং সুস্থ দৃঢ় অঙ্গ দিয়ে প্রভু পরমেশ্বরের প্রার্থনা করে পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত করার প্রার্থনা করা হয়েছে। কানে ছিদ্র করার তো কোনো কথাই নাই। পাঠক অতি সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে মন্ত্রের অর্থ বা ভাষ্যকে মন্ত্রের দেবতা, ছন্দ, পদ পদার্থের অনুসারে করাটাই উচিৎ। মন্ত্রার্থকে বিনিয়োগের পেছনে চালানো বা পদ-পদার্থের উপেক্ষা করে বিনিয়োগের অনুসারে অর্থকে ভেঙে-চুরে দেওয়া অন্যায়। মন্ত্রার্থানুসারী বিনিয়োগ উচিৎ, না কি বিনিয়োগের অনুসারে অর্থ। অন্ততঃ কোন্ মন্ত্রের কোথায়, কোন্ কর্মকান্ডে বিনিয়োগ হবে, কোথায় হবে না—এটি একটি মহত্ত্বপূর্ণ সমস্যা। মন্ত্র তো অপৌরুষেয়, পরমেশ্বর মানবের কল্যাণার্থে সেগুলি প্রদান করেছেন। কোন মন্ত্রে কি পদ, কি ছন্দ, পূর্ব কী, পর কী ; এসব ঈশ্বরপ্রদত্ত হওয়ার কারণে প্রশ্ন করা উচিৎ নয়। কিন্তু কর্মকান্ড এবং তাতে করণীয় ক্রিয়াসমূহ, ক্রিয়াতে পঠনীয় মন্ত্র, কোন মন্ত্রক পড়ে কী কী ক্রিয়া করা যাবে—এসব নির্ণয়-নির্ধারণ ঋষিরা পরবর্তীকালে করেছেন। চারটি সংহিতাতে কুড়ি হাজারের বেশী মন্ত্র আছে। যে কোন মন্ত্র যে কোন স্থানে পড়া যায় না। কোথায়, কোন্ কর্মে কোন্ মন্ত্রকে পড়া যায়? কুড়ি হাজারের বেশী মন্ত্র থেকেই বেছে নিতে হবে—এসব পরবর্তীকালে ঋষিগণ নির্ধারিত করেছেন। তাঁদের মন্ত্রকে বেছে নেওয়ার আধার তো যেমন খুশী হতে পারেনা, কোনো আধার তো হওয়াই উচিৎ এবং সেই আধার অর্থকে বাদ দিয়ে অন্য তো হওয়াই উচিৎ নয়। অতএব অর্থের আধারেই বিনিয়োগ হওয়া উচিৎ। যে কোনো মন্ত্রের যে কোনো জায়গায় বিনিয়োগ ইচ্ছানুসারে করে আবার মন্ত্রার্থকে বিনিয়োগের অনুসারে করা তো অনুচিৎ, অন্যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সায়ণ, মহীধর ইত্যাদি আচার্যেরা বিনিয়োগের অনুসারে মন্ত্রের অর্থ করে গেছেন।

বিনিয়োগের জন্য বিদ্বানেরা কল্পসূত্রের নির্মাণ করেছেন। আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বোধায়ন আদি নিজের নিজের নামেরই কল্পসূত্র তৈরি করেছেন। সায়ণের মতে কল্পের অর্থ হল—**"কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগ প্রয়োগোঽ ত্রেতি"** —এর ভাবার্থ হল যে যাগ-যজ্ঞকে কিভাবে করা উচিৎ অর্থাৎ কোন্ ক্রিয়া করার আবশ্যকতা? কোন্ কোন্ মন্ত্র পড়তে হবে? কোন্ মন্ত্র পড়ে কোন্ ক্রিয়া করা উচিৎ ইত্যাদি বিনিয়োগ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।

বিনিয়োগের প্রকার

বিনিয়োগ দুই প্রকারের বলা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে একটি উল্লেখ রয়েছে —(১) রূপসমৃদ্ধতা সহিত, (২) রূপসমৃদ্ধতা রহিত।

"এত্দ বৈ যজ্ঞস্য সমৃদ্ধং যদ্ রূপং সমৃদ্ধং যত্ কর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্ভির্বদতি।" অর্থাৎ যদি এই ধরণের মন্ত্র বলা যায় যাতে ক্রিয়মাণ ক্রিয়ার বর্ণনা হবে তাহলে সেটি রূপসমৃদ্ধতা সহিত হবে। এই ধরণের বিনিয়োগকে ভালো বলে মেনে নেওয়া হয়। যদি ক্রিয়মান ক্রিয়ার বর্ণনা সেই পঠিত মন্ত্রে না হয় তাহলে সেটি রূপসমৃদ্ধতা রহিত বিনিয়োগ হবে। সেটি রূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগ হবে না।

স্বামী দয়ানন্দের রূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগ

স্বামী দয়ানন্দজি সন্ধ্যাতে, অগ্নিহোত্রে, যজ্ঞে, সংস্কারে মন্ত্রের বিনিয়োগ করেছেন। কোন মন্ত্র পড়ে কি ধরনের ক্রিয়া করা যাবে, এর কি কোনো বিধান লেখা আছে? আমরা তো একথা বলছি না যে স্বামীজীর দ্বারা বিহিত সমস্ত বিনিয়োগই রূপসমৃদ্ধ কিন্তু স্বামীজী দ্বারা নির্দিষ্ট এক-দুটি রূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগকে আমরা নীচে লিখছি—(১) যজ্ঞ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর প্রথম ক্রিয়া হল যজ্ঞকুন্ডে অগ্নির স্থাপনা করা, যাজ্ঞিক ভাষাতে 'অগ্ন্যাধান' বলা হয়। স্বামীজী অগ্ন্যাধানের জন্য নিম্ন মন্ত্রের বিধান করেছেন—**"ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বর্দ্যৌরিব ভূম্না পৃথিবীব বরিম্ণা। তস্যাস্তে পৃথিবী দেবযজনি পৃষ্ঠেঽগ্নিমন্নাদমন্নাদ্যায়াদধে।।"** যজু (৩-৫)। এই মন্ত্রের অর্থ হল—হে সর্বরক্ষক প্রাণাধার, দুঃখবিনাশক, সুখদাতা পরমেশ্বর! আপনার কৃপাতে আমি এই দেবতাদের যজ্ঞস্থলীর পীঠের উপর অগ্ন্যাধান করিতেছি (অগ্নিং আদধে)। আমাদের যজ্ঞভূমি দ্যুলোকের মতো ভূমা, পৃথিবীর মতো শ্রেষ্ঠ বিস্তৃত এবং অগ্নি হল অন্নাদ।

এখানে অগ্নিস্থাপন = অগ্ন্যাধানের ক্রিয়া করা হচ্ছে এবং এই কর্মকাণ্ডে পঠিত মন্ত্রে উল্লেখ আছে 'অগ্নিমাদধে' অর্থাৎ অগ্নিকে আধান করছি। অতএব আমরা কি দেখছি যে, যে ক্রিয়া করা হচ্ছে মন্ত্রে তাঁরই পাঠ হচ্ছে। অতঃ এটি রূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগ হল। (২) যজ্ঞে দ্বিতীয় ক্রিয়া : কুণ্ডে রাখা অগ্নিকে কর্পূর রেখে ; ছোটো ছোটো শুকনো সমিধা রেখে অগ্নিকে পাখা দিয়ে প্রদীপ্ত করা হয়। এই অগ্নিসমিন্ধন ক্রিয়াতে নিম্ন মন্ত্রের পাঠ করার বিধান স্বামী দয়ানন্দজী করেছেন—

"ওম্ উদবুদ্ধস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্তে সংসৃজেথাময়ং চ। অস্মিন্ত্সধস্থেঽ অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চসীদত॥" যজু-১৫-১৪

এই মন্ত্রে যজমান পরমেশ্বরের স্মরণ করে অগ্নি, যজ্ঞাগ্নিকে বলছে যে হে অগ্নে! তুমি খুব ভালোভাবে উদ্দীপ্ত হও (উদবুধ্যস্ব অগ্নে) এবং আমাদের ইষ্ট আপূর্তিকে ভালোভাবে সম্পাদন কর। আমাদের এই যজ্ঞশালাতে এবং এর থেকেও অধিক ভব্যসুন্দর যজ্ঞশালাতে সংসারের দেবপুরুষ, শ্রেষ্ঠলোক আসন গ্রহণ করুক।

অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করার সময় এই মন্ত্রকে পড়া হয় এবং এতে অগ্নিকে 'উদবুধ্যস্ব' প্রজ্জ্বলিত হওয়ার জন্যও বলা হয়—অতঃ উক্ত মন্ত্রের বিনিয়োগে রূপসমৃদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

মধ্যকালে ইচ্ছা খুশী বিনিয়োগ

স্বামী দয়ানন্দজি দ্বারা নির্দিষ্ট অনেক বিনিয়োগে রূপসমৃদ্ধতা আছে। কিন্তু মধ্যকালে কিভাবে বেদমন্ত্রকে ইচ্ছামতো যেখানে সেখানে পড়া যেতে লাগলো —উদাহরণতঃ এখনই আমরা 'উদবুধ্যস্ব অগ্নে' মন্ত্রটিকে উল্লেখ করেছি— মন্ত্রে অগ্নিকে উদবুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষে এই মন্ত্র নবগ্রহের মধ্যে বুধ গ্রহের জন্য জপের বৈদিক মন্ত্র রূপে প্রচার করা হয়, বলা হয়। এই মন্ত্রে বুধ গ্রহের নাম মাত্রই নেই। উচ্চারণে বুধ থেকে হাল্কা ধরনের ধ্বনিসাম্য প্রতীত হয় নিরক্ষরদের কাছে। কিন্তু বাস্তবে এই মন্ত্রে বুধ সম্বন্ধে কোন সম্পর্কই নেই। স্বামী দয়ানন্দ এই সব কপোলকল্পিত কর্মকাণ্ড থেকে বেদমন্ত্রের রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বাস্তবিক মর্মকে বোঝার জন্য দিশাদান দিয়েছেন।

অসম্ভব কল্পনা :—

আচার্য্য সায়ণ, মহীধর, উব্বট আদি কর্মকাণ্ডে প্রযুক্ত হওয়া মন্ত্রের প্রয়োগেই

কেবল অন্ধকারই করে রাখেননি, পরন্তু কাল্পনিক অসম্ভব কথাগুলিকে বেদমন্ত্রের ভাষ্যে জুড়ে দিয়ে মন্ত্র এবং মন্ত্রার্থকে হাস্যাস্পদ এবং অসম্ভব করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে—

"ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাং চেষ্টৌ বিদৎ সরমা তনয়ায় ঘাসিম্।

বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্গদাঃ সমুস্রিয়াভির্বাবশন্ত নরাঃ॥ ১-৬৩-৩

সায়ণাচার্য্য উক্তমন্ত্রের উপরে একটি কাহিনী লিখেছেন—"সরমা নামক একটি কুকুরী দেবতাদের কাছে ছিল। পণিলোক (বাজারু) ইন্দ্রের গাভি সমূহকে চুরি করে নিয়ে গেল। ইন্দ্র সরমাকে গাভী খুঁজে নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন যেমন ব্যাধ হরিণকে খোঁজার জন্য জঙ্গলে কুকুর ছেড়ে দেয়। সরমা ইন্দ্রকে বলল যে আমি তো খোঁজার জ্ন্য তবেই যাবো যখন তুমি সেই গাভীদের দুধ আমার ছেলেমেয়েদের জন্য দেবে। ইন্দ্র তথাস্তু বলে দিলেন। এই প্রসঙ্গের উপরে শাট্যায়ন বলছেন—"ইন্দ্র বললেন—সরমা! তুই আমার গাভিগুলিকে খুঁজে দিয়েছিস, এখন আমি তোর সন্তানকে অন্নাদি রূপ দুধ পান করাবো।"

পাঠক এই তথ্যকে অতি সরলভাবে বুঝতে পারছেন যে এই মন্ত্রে উক্ত কথার দূর থেকেও কোন সংকেত পাওয়া যাচ্ছে না। এতে একটি মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ হল—'সরমা'। সায়ণাচার্য লিখেছেন—"সরমা নাম দেবশুনী"। অর্থাৎ সরমা নামক একটি দেবতাদের কুকুরী ছিল। সরমা শব্দের অর্থ তো দেবতাদের কুকুরী নয়। এটি আচার্য্য সায়ণের মতো বিদ্বান্ কোথা থেকে তৈরি করলেন? সায়ণাচার্য্য "সরমা সরণাত্ (নিরুক্ত ১১-২৪) "ইতি যাস্কঃ সর্তেরৌণাদিকঃ অম প্রত্যয়ঃ"—এইরকম স্বয়ং লিখেছেন।

সায়ণাচার্য্য অন্যত্র ঋগ্বেদেই সরমার 'স্তুতিরূপাবাক্' অর্থ করেছেন। ঋগ্ ৩-৩১-৬ তে লিখেছেন—'সরমা সরণশীলা স্তুতিরূপাবাগ্।" এখন তাহলে শোধবৈদুষ্যের আরও একটি আকাঙ্ক্ষা হল যে 'সরমা নাম দেবশুনী' আচার্য্য সায়ণের মতো বিদ্বান্দের কিভাবে উচিৎ ন্যায়সঙ্গত অর্থ পরিলক্ষিত হয়েছে? আমাদের মনে হয়, আচার্য্য সায়ণ হোক বা উব্বট বা মহীধর বা অন্য কেউ —এঁরা সবাই নিজেদের সাম্প্রদায়িক মান্যতা ব্যাপারে অসহায় ছিলেন। এঁরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক ভাবনা, কাহিনী, জনশ্রুতিগুলিকে বেদে সংযোগ করার জন্য প্রতিবদ্ধ ছিলেন। এইসব বাধ্যতা—অসহায়তা এতদূর পর্য্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল যে বেদমন্ত্রের অর্থে এদিক-সেদিক থেকে অর্থহীন কথা সংযোগ করতেন। এ তো প্রভু-কৃপাতে স্বামী দয়ানন্দের সাহস এবং বৈদুষ্য ছিল যে তিনি বেদার্থকে পুরা কল্পনা ও বিনিয়োগের গল্প থেকে মুক্ত করে বেদের সত্যভাষ্য করেছেন।

স্বামী দয়ানন্দ-কৃত অর্থ

এই মন্ত্রের উপর স্বামী দয়ানন্দের ভাষ্য দেখার মত। স্বামীজী লিখেছেন—
(ইন্দ্রস্য) পরমৈশ্বর্যবতঃ সভাধ্যক্ষস্য, (অঙ্গিরসাং) বিদ্যাধর্মরাজ্য প্রাপ্তিমতাং বিদুষাং। অঙ্গিরস ইতি পদনাম. নিঘন্টু ৫-৫ (চ) সমুচ্চয়ে, (ইষ্টৌ) ইষ্ট সাধিকায়াং নীতৌ, (বিদত্) প্রাপ্নুয়াৎ, অত্র লিঙ্গর্থে লঙডাভাবশ্চ। (সরমা) যথাসরান্ বিদ্যাধর্ম বোধান্ মিমীতে তথা। 'আতোঽনুপসর্গে কঃ ইতি কঃ প্রত্যয়ঃ। (তনয়ায়) সন্তানায় (ঘাসীম্) অন্নাদিকং। ঘাসমিতি অন্ননাম। (নিঘ. ২-৭), (বৃহস্পতিঃ) বৃহতাংপতিঃ পালয়িতা সভাধ্যক্ষঃ, (ভিনৎ) ভিনত্তি। অত্র লঙর্থে লঙডাভাবশ্চ, (অদ্রিম্) মেঘং (বিদৎ) প্রাপ্নোতি। অস্যামি সিদ্ধিঃ পূর্ববৎ। (গাঃ) পৃথিবীঃ (সম্) সম্যগর্থে, (উস্রিয়াভিঃ) কিরণৈঃ (বাবশন্তঃ) পুনঃ পুনঃ প্রকাশয়ন্তঃ (নরঃ) যে নৃণন্তি-নয়ন্তি-তে মনুষ্যাস্তৎসম্বুদ্ধৌ। অন্বয়ঃ—হে নরো মনুষ্যাঃ। যথা সরমা মাতা তনয়ায় ঘাসিং বিদৎ প্রাপ্নোতি, যথা বৃহস্পতিঃ সভাধ্যক্ষৌ যথা সূর্য্য উস্রিয়াভিঃ কিরণৈঃ অদ্রিং ভিনদ্ বিদৃণাতি, যথা গাঃ বিদত্ প্রাপ্নোতি তথৈব যূয়মপি ইন্দ্রস্য অঙ্গিরসাং চ ইষ্টৌ বিদ্যাদি সদ্‌গুণান্ সেবাবশন্তঃ পুনঃ পুনঃ সম্যক্ প্রকাশয়ন্তঃ যতঃ সর্বস্মিন্ অবিদ্যাদি দুষ্ট গুণাঃ নশ্যেয়ুঃ।

ভাবার্থ ঃ মনুষ্যের উচিৎ মাতার সমান প্রজ্ঞাতে সূর্য্যের সমান বিদ্যাদি উত্তম গুণসমূহের প্রকাশ করে, ঈশ্বরের দ্বারা উক্ত বা বিদ্বানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নীতিতে স্থিত সকলের উপকার করে বিদ্যাদি সদ্‌গুণের আনন্দে সর্বদা বিদ্যমান হোক্।

এক প্রশ্ন

এখন একটি সহজধরনের প্রশ্ন উঠছে যে যখন সায়ণাচার্য্য স্বয়ং সরমার অর্থ 'সরণশীলা স্তুতিরূপাবাক্ (ঋগ্ ৩-৩১-১) করেছেন এবং এই মন্ত্রে দেবশুনী (ধ্যান থাকে-মন্ত্রে) দেবতাদের কুকুর বা গাভীদের চুরি সম্বন্ধে না কোন শব্দ আছে, না কোন প্রসঙ্গ। পুনঃ ভাষ্যে গাভীদের চুরি করার কথা কোথা থেকে এল? যদি কোন পুরাণকথা বা সাম্প্রদায়িক প্রতিবদ্ধতা ছিল তাহলেও এই ধরনের কথা বা বাধ্যতাও বিদ্বানদের মধ্যে এই ভাষ্যের অলংকার মানা যেতে পারে না। সারমেয় শব্দের পরবর্তী লোকসংস্কৃতে অর্থ কুকুরই হয় কিন্তু এর আধার তো 'সরমা'-ই। সরমা হল মূল শব্দ এবং সারমেয় হল সরমার অপত্যবাচী-সারমেয়ঃ = সরমা + ঢক্। পুনরপি এই প্রকারের কথা বা সাম্প্রদায়িকতাও অন্বেষণীয়। বেদার্থের জন্য এই প্রকারের চেষ্টা তো শ্লাঘনীয়

নয়ই কি বেদমন্ত্রের ভাষ্যের আধার লোকব্যবহারে প্রচলিত কাহিনীগুলিকে তৈরি করা যায়। বেদে সরমা কোনো বিরল শব্দ নয়। যজু. ৩৩-৫৯-এ সরমার অর্থ আচার্য্য উব্বট লিখেছেন—'সরমা = সরমা বাক্ ত্রয়ী লক্ষণা'। আচার্য্য মহীধরও সরমার অর্থ 'বাক্' করেছেন। 'সরমা সরণিঃ' (যাস্ক) এতসব দেখেও আচার্য্য সায়ণের সরমার অর্থ কুকুর চিন্তনীয় বিষয়।

এই প্রসঙ্গের উপসংহার করতে গিয়ে আমরা বিদ্বৎবর্গের ধ্যান এই তথ্যের দিকে আকৃষ্ট করছি যে সম্মান্য আচার্য্যগণ বেদকে ঈশ্বরপ্রদত্ত মানেন। মহাভারতের একটি শ্লোক রয়েছে—

"অনাদি নিধনা নিত্যা, বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা, যতঃ সর্বা প্রবৃত্তয়ঃ॥"

এর ভাবার্থ হল যে স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে এই অনাদি অনন্ত দিব্য বেদ বিদ্যার উপদেশ মনুষ্যদের প্রদান করেছেন, এখান থেকেই সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়েছে। "ভূতং ভুবৎ ভবিষ্যচ্চ সর্বং বেদাত্যপিধ্যতি"—(মনু ১২-৯৭) বিদ্বানদের কাছে নিশ্চয়ই বিচারণীয় যে এই ধরনের কাহিনী এবং এই ধরনের ভাষ্য কি ঈশ্বরীয় জ্ঞানের গরিমা-পোষক, স্বামী দয়ানন্দের অর্থ অথবা আচার্য্য সায়ণের অর্থ যা দেবতাদের কুকুর'র অর্থ সরমাকে দিয়ে উপহাসমূলক কথার আধারে? দুটোর মধ্যে কোন্‌টি ঈশ্বরীয় নিত্য? এই প্রশ্ন বিদ্যার নয়—বেদভাষ্যের আধারের দিশা-সিদ্ধান্ত, মান্যতা, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন। এই ধরনের অর্থকে পড়ে বিদ্বানদের মধ্যে বেদজ্ঞান বা বেদের শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ ভাব তো উৎপন্ন হতেই পারে না। হ্যাঁ, যদি আজকের বিদ্বান্ বেদকে তিরস্কার করে দেন তো তাঁদের দোষ কি? গৌতম বুদ্ধও তো যজ্ঞে পশুবলি দেখে বেদের তিরস্কার করেছিলেন।

পাঠকবর্গের জ্ঞানের জন্য আরও একটি মন্ত্র—তার বিনিয়োগ এবং ভাষ্য প্রস্তুত করা হয়েছে **"ইদং পিত্রে মরুতামুচ্চতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনম্। রাস্বা চ নো অমৃত মৃত ভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃল।"** ঋগ্বেদ-১-১১৪-৬—উক্ত মন্ত্রের উপর সায়ণাচার্য্য নিম্নপ্রকার বিনিয়োগ দিয়েছেন—"রুদ্রদেবত্যে পশৌ বপাপুরাডাশয়োঃ 'মৃলানো রুদ্র' ইত্যাদিকেদ্বে অনুবাক্যে। তথা চ সূত্রিতং—**'মৃলা নো রুদ্রোতং নো ময়স্কৃধি ইতি দ্বে আতে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু।'** (আশ্বলায়ন শ্রৌত্রসূত্র-৩৮)—অর্থাৎ এই দুই অনুবাক্যের সম্বন্ধ হল রুদ্রদেবতাযুক্ত পশুযাগে বপা এবং পুরোডাশের সম্বন্ধে। আচার্য্য সায়ণ এর উপরে একটি কথা-কাহিনী (বিনা মাথা, পা যুক্ত বাজে ধরনের) লিখেছেন—**"পুরাকদাচিদিন্দ্রঃ অসুরাঞ্জিগাথ্ তদানীং**

দিতি অসুরমাতা ইন্দ্রহনন সমর্থং পুত্রং কাময়মানা তপসা ভর্ত্তুঃ সকাশাদ্ গর্ভং লেভে। ইমং বৃত্তান্তমবগচ্ছন্নিন্দ্রো ব্রজহস্তঃ সন্ সূক্ষ্মরূপোভূত্বা তস্যা উদরং প্রবিশ্য তং গর্ভং সপ্তধা বিভেদ্। পুনরপ্যেকৈকং সপ্তখন্ডমকরোৎ। তে সর্বে গর্ভৈকদেশা যোনের্নির্গত্য অরুদন্। এতস্মিন্নবসরে লীলার্থং গচ্ছন্তৌ পার্বতী পরমেশ্বরৌ ইমান্ দদৃশতুঃ। মহেশং প্রতি পার্বতী এবমোচৎ। ইমে মাংসখন্ডা প্রত্যেকং পুত্রা সম্পদ্যন্তামেবং ত্বয়া কার্যং ময়ি চেৎপ্রীতি রস্তীতি। স চ মহেশ্বরঃ তান্ সমান রূপান্ সমান বয়সঃ সমানালংকারান্ পুত্রান্ কৃত্বা গৌর্যৈ প্রদদৌ, তবেমে পুত্রাঃ সন্তু ইতি। অতঃ সর্বেষু মারুতেষু সূক্তেষু মরুতঃ রূদ্রপুত্রাঃ ইতি স্তুয়ন্তে। রৌদ্রেষু চ মরুতাং পিতা রুদ্র ইতি।”

—আচার্য্য সায়ণ দ্বারা লিখিত এই কথার হিন্দী অনুবাদ নিম্নরূপ— প্রাচীনকালে কখনও ইন্দ্র অসুরদিগকে জয় করে নিয়েছিলেন। অসুরদের মাতা দিতি এই কামনা করলেন যে ইন্দ্রের হনন করতে সমর্থ পুত্র উৎপন্ন হোক্। উনি তপ করলেন এবং নিজের পতির সম্পর্কে গর্ভধারণ করলেন। উক্ত বৃত্তান্ত জানার পর ইন্দ্রও হাতে বজ্র নিয়ে সূক্ষ্মরূপধরে দিতির পেটে প্রবেশ করে সেই গর্ভের প্রথমেই সাতখন্ড করে দিলেন। আবার এক একটির সাত-সাত (৭ × ৭ = ৪৯) খন্ড করে দিলেন। সেইসব গর্ভখন্ড পেট থেকে বাইরে এসে কাঁদতে লাগল। সেই অবসরে শিব এবং পার্বতী লীলা করার জন্য যাচ্ছিলেন এবং তাদেরকে ক্রন্দন অবস্থায় দেখে নিলেন। তখন পার্বতী মহেশ্বরকে বললেন যে আপনি যদি আমার প্রতি প্রীতি রাখেন তাহলে এইসব টুকরোগুলিকে এক একটা পুত্র করে দিন। শিবজী সেই সব ঊনপঞ্চাশ খন্ডগুলিকে সমানরূপ, সমান আয়ু, সমান অলংকারযুক্ত পুত্র তৈরি করে গৌরীকে দিলেন। তখন থেকে সমস্ত মরুৎ সূক্তে মরুৎদেরকে রুদ্রপুত্র বলে স্তুতি করেন এবং মরুৎসমূহের পিতা বলা হয়।

এই হল বিনিয়োগের চমৎকার! আজকের যুগে কে এই ধরনের কথাকে বুদ্ধিসংগত এবং শ্রদ্ধেয়রূপে স্বীকার করবে? এখন সায়ণাচার্য্যের অর্থকেও দেখে নিন—“(ইদং) স্তুতি লক্ষণং বচঃ (মরুতাম্) একনোপঞ্চাশৎ সংখ্যাকানাং দেব বিশেষাণাং (পিত্রে) জনকায় (রুদ্রায়) ঈশ্বরায় (উচ্চতে) উচ্চার্যতে। কীদৃশম্। (স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ) রসবতো মধুঘৃতাদেরপি স্বাদুতরম্। অতিশয়েন হর্ষতরমিত্যর্থঃ (বর্ধনং) স্তুত্যস্য প্রবর্ধকম্। স্তোত্রেণ হি দেবতা প্রহৃষ্টাসতী প্রবর্ধতে। (অমৃত) মরণরহিত রুদ্র। (মর্ত ভোজনম্) মর্তানাং মনুষ্যাণাং ভোগ পর্যাপ্ত মন্নং (নঃ) অস্মভ্যং (রাস্ব) প্রযচ্ছ। তথা (ত্মনে) আত্মনে। দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী মাম্। (তোকায়) তোকং পুত্রং (তনয়ায়) তনয়ং তৎপুত্রং চ (মৃল) সুখয়।”

উক্ত সবটির ভাবার্থ হল—

ঊনপঞ্চাশ মরুতের পিতা রুদ্রের স্তুতি করা হচ্ছে। হে অমর রুদ্র! আমাদেরকে ভোগের জন্য পর্যাপ্ত অন্ন দিন তথা আমাদের পুত্র-পৌত্রদের সুখী করুন।

এখন দৃষ্টিকোণের কারণে উল্টাপুল্টা বিনিয়োগ, ঊনপঞ্চাশ পবনের পৌরাণিক কল্পনা, গর্ভখন্ডকে সমানাকৃতি পুত্র করে দেওয়া ইত্যাদি তো; বুদ্ধিসংগত মোটেই নয়, বেদের উপর শ্রদ্ধা কমানোর কারণ অবশ্য হয়ে উঠে। ফলে যদি লোকেরা বেদকে রাখাল বালকদের গীত বলে মনে করে —এতে আশ্চর্য্য কি?

তুলনা করার জন্য তথা বাস্তবিক অর্থের জন্য স্বামী দয়ানন্দকৃত ভাষ্যকেও দেখা উচিৎ—

(ইদম্) (পিত্রে) পালকায় (মরুতাম্) ঋতাবৃতৌ যজতাং বিদুষাং (উচ্চতে) উপদিশ্যতে। (বচঃ) বচনম্ (স্বাদোঃ) স্বাদিষ্টাৎ (স্বাদীয়ঃ) অতিশয়েন স্বাদু প্রিয়করম্ (রুদ্রায়) সভাধ্যক্ষায় (বর্ধনম্) বৃদ্ধিকরম্ (রাস্বা) দেহি। অন্নদ্বয়- চোহতস্তিঙ ইতি দীর্ঘঃ (চ) অনুক্ত সমুচ্চয়ে (নঃ) অস্মভ্যং অস্মাকং বা (অমৃত) নাস্তি মৃতং মরণদুখং যেন তৎসম্বুদ্ধৌ। (মর্ত ভোজনম্) মর্তানাং মনুষ্যণাং ভোগ্যং বস্তু (ত্মন্) আত্মনে তোকায় হ্রস্বায় বালকায় (তনয়ায়) যুনে পুত্রায় (মৃড) সুখয়।

স্বামী দয়ানন্দ এর পদার্থ নিম্নপ্রকার করেছেন—

"হে (অমৃত) মরণ দুঃখ দূর কারক তথা আয়ুবৃদ্ধিকারক বৈদ্যরাজ বা উপদেশক বিদ্বান্! আপনি (নঃ) আমাদের (ত্মনে) শরীর (তোকায়) ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে (তনয়ায়) যুবক ছেলে (চ) সেবক বৈতনিক বা আয়ুধিক ভৃত্য অর্থাৎ চাকরদের জন্য (স্বাদোঃ) স্বাদিষ্ট থেকে (স্বাদীয়ঃ) স্বাদিষ্ট অর্থাৎ সবপ্রকার স্বাদযুক্ত ভোজন যা খেতে খুব ভালো লাগে সেই (মর্ত্য ভোজনম্) মনুষ্যদের ভোজ্য পদার্থকে (রাস্ব) দাও। যে (ইদম্) এই (মরুতাম্) প্রত্যেক-ঋতুতে যজ্ঞ কর্ত্তা বিদ্বানদের (বর্ধনম্) বর্ধক (বচঃ) বচন (পিত্রে) পালনা করতে (রুদ্রায়) এবং দুষ্টকে কাঁদায় এমন সভাধ্যক্ষের জন্য (উচ্চতে) বলা হয়—তাঁদের থেকে আমাদেরকে (মৃড) সুখী করুন।

"বৈদ্য এবং উপদেশকদের এটা যোগ্য যে স্বয়ং নীরোগ এবং সত্যাচারী হয়ে সব মনুষ্যের জন্য ঔষধ দিয়ে এবং উপদেশ করে, উপকার করে সবাইয়ের নিরন্তর রক্ষা করেন।"

এখানে সবকিছুই অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে মন্ত্রে না তো ইন্দ্রের দ্বারা গর্ভে প্রবেশ করে ভ্রূণকে ৪৯ ভাগে কেটে দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর কুটিল কার্যের বর্ণনা আছে, না শিব-পার্বতীর ভ্রমণ, না ৪৯ রুদ্রপুত্র ইত্যাদি কিছুই তো

উক্ত সবটির ভাবার্থ হল—

ঊনপঞ্চাশ মরুতের পিতা রুদ্রের স্তুতি করা হচ্ছে। হে অমর রুদ্র! আমাদেরকে ভোগের জন্য পর্যাপ্ত অন্ন দিন তথা আমাদের পুত্র-পৌত্রদের সুখী করুন।

এখন দৃষ্টিকোণের কারণে উল্টাপুল্টা বিনিয়োগ, ঊনপঞ্চাশ পবনের পৌরাণিক কল্পনা, গর্ভখন্ডকে সমানাকৃতি পুত্র করে দেওয়া ইত্যাদি তো; বুদ্ধিসংগত মোটেই নয়, বেদের উপর শ্রদ্ধা কমানোর কারণ অবশ্য হয়ে উঠে। ফলে যদি লোকেরা বেদকে রাখাল বালকদের গীত বলে মনে করে —এতে আশ্চর্য্য কি?

তুলনা করার জন্য তথা বাস্তবিক অর্থের জন্য স্বামী দয়ানন্দকৃত ভাষ্যকেও দেখা উচিৎ—

(ইদম্) (পিত্রে) পালকায় (মরুতাম্) ঋতাবৃতৌ যজতাং বিদুষাং (উচ্চতে) উপদিশ্যতে। (বচঃ) বচনম্ (স্বাদোঃ) স্বাদিষ্টাৎ (স্বাদীয়ঃ) অতিশয়েন স্বাদু প্রিয়করম্ (রুদ্রায়) সভাধ্যক্ষায় (বর্ধনম্) বৃদ্ধিকরম্ (রাস্বা) দেহি। অন্নদ্বয়- চোহতস্তিঙ ইতি দীর্ঘঃ (চ) অনুক্ত সমুচ্চয়ে (নঃ) অস্মভ্যং অস্মাকং বা (অমৃত) নাস্তি মৃতং মরণদুখং যেন তৎসম্বুদ্ধৌ। (মর্ত ভোজনম্) মর্তানাং মনুষ্যণাং ভোগ্যং বস্তু (ত্মন্) আত্মনে তোকায় হ্রস্বায় বালকায় (তনয়ায়) যুনে পুত্রায় (মৃড) সুখয়।

স্বামী দয়ানন্দ এর পদার্থ নিম্নপ্রকার করেছেন—

"হে (অমৃত) মরণ দুঃখ দূর কারক তথা আয়ুবৃদ্ধিকারক বৈদ্যরাজ বা উপদেশক বিদ্বান্! আপনি (নঃ) আমাদের (ত্মনে) শরীর (তোকায়) ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে (তনয়ায়) যুবক ছেলে (চ) সেবক বৈতনিক বা আয়ুধিক ভৃত্য অর্থাৎ চাকরদের জন্য (স্বাদোঃ) স্বাদিষ্ট থেকে (স্বাদীয়ঃ) স্বাদিষ্ট অর্থাৎ সবপ্রকার স্বাদযুক্ত ভোজন যা খেতে খুব ভালো লাগে সেই (মর্ত্য ভোজনম্) মনুষ্যদের ভোজ্য পদার্থকে (রাস্ব) দাও। যে (ইদম্) এই (মরুতাম্) প্রত্যেক-ঋতুতে যজ্ঞ কর্ত্তা বিদ্বানদের (বর্ধনম্) বর্ধক (বচঃ) বচন (পিত্রে) পালনা করতে (রুদ্রায়) এবং দুষ্টকে কাঁদায় এমন সভাধ্যক্ষের জন্য (উচ্চতে) বলা হয়—তাঁদের থেকে আমাদেরকে (মৃড) সুখী করুন।

"বৈদ্য এবং উপদেশকদের এটা যোগ্য যে স্বয়ং নীরোগ এবং সত্যাচারী হয়ে সব মনুষ্যের জন্য ঔষধ দিয়ে এবং উপদেশ করে, উপকার করে সবাইয়ের নিরন্তর রক্ষা করেন।"

এখানে সবকিছুই অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে মন্ত্রে না তো ইন্দ্রের দ্বারা গর্ভে প্রবেশ করে ভ্রূণকে ৪৯ ভাগে কেটে দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর কুটিল কার্য্যের বর্ণনা আছে, না শিব-পার্বতীর ভ্রমণ, না ৪৯ রুদ্রপুত্র ইত্যাদি কিছুই তো

নেই। সায়ণের উপর এই সাম্প্রদায়িক বাধ্যতা ছিল যে এই ধরনের বুদ্ধি বিপরীত অর্থ করার জন্য তাঁকে বাধ্য হতে হয়েছিল। এই প্রকারের বিনিয়োগ এবং ভাষ্য থেকে বেদকে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দাবি কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারবে না। এই ধরনের বিনিয়োগ এবং অর্থকে দেখে সংসারের বিদ্বান্ বেদকে ভেড়া চরানোর গীত বা জংলীদের গীত-ই বলবে।

মন্ত্রের অর্থ হল মুখ্য, নিজে নিজে স্বাধীন। বিনিয়োগ অর্থানুসারে হওয়া উচিৎ। সায়ণ, উব্বট, মহীধর আদি মধ্যকালীন ভাষ্যকারেরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক বিনিয়োগসমূহকে বলপূর্বক শব্দ, অর্থ, সন্দর্ভ আদির উপেক্ষা করে বেদমন্ত্রের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। বিনিয়োগ অনুসারে মন্ত্রার্থ করলে অর্থের অনর্থই পাওয়া যায়। অর্থের আধারেই কর্মকান্ডে মন্ত্রের বিনিয়োগ করা উচিৎ।

বেদ সব সত্য বিদ্যার পুস্তক

স্বামী দয়ানন্দের সুস্পষ্ট মান্যতা হল যে সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান মূলরূপে, বীজরূপে বেদে রয়েছে। ঋষিগণ সেই বীজকে পল্লবিত করেছেন। মনুস্মৃতিতে লেখা আছে—

"সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ"-মনু-১-১-২৬—অর্থাৎ বেদ সম্পূর্ণ জ্ঞানের মূল। স্বামী দয়ানন্দজী আর্য্য সমাজের তৃতীয় নিয়মে বলেছেন—"বেদ হল সমস্ত সত্যবিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ-শ্রাবণ করা সব আর্য্যদের পরমধর্ম।" এতো এক কথনমাত্র, এক দাবি, এক প্রতিজ্ঞা। তা স্বামী দয়ানন্দই বলুন বা মনুই বলুন। সারা সংসার কেন মেনে নেবে যে সব জ্ঞানবিজ্ঞান বিশেষ করে রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, যোগ আদি সব মূলরূপে বেদে উপলব্ধ রয়েছে?

স্বামী দয়ানন্দের এই কথা যে, "বেদ সব সত্যবিদ্যার এবং পদার্থবিদ্যার মূল"—এটিট বাধকতা আসে যে মধ্যকালের আচার্য্যেদের বেদভাষ্য যজ্ঞ-কর্মকান্ডপরক। ডা. সোমদেব শাস্ত্রী তাঁর নিজের 'যজুর্বেদ সন্দেশ' গ্রন্থে মধ্যকালীন ভাষ্যকারদের একটি হিসাব প্রস্তুত করেছেন—

ঃ মধ্যকালের বেদভাষ্যকার ঃ

(১) স্কন্দস্বামী (বি. সং-৬৮৭) ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের ৪-৫ সূক্তের অধিযাজ্ঞিক (কর্মকান্ডপরক) ভাষ্য করেছেন।

(২) উদ্গীথ হচ্ছিলেন আচার্য্য স্কন্দস্বামীর সমকালীন। উনি ঋগ্বেদের দশম

মন্ডল সূক্ত ৫ মন্ত্র ৪ থেকে সূক্ত ৮৬ মন্ত্র ৬ পর্যন্ত কর্মকান্ডপরক ভাষ্য করেছেন।

(৩) ভেংকট মাধব (বি. ১২ শতাব্দী) ঋগ্বেদ ভাষ্য আধিযাজ্ঞিক প্রক্রিয়াতে করেছেন।

(৪) আত্মানন্দ (বি. ১৩ শতাব্দী) অস্যবামীয় সূক্তের (ঋগ্বেদ মন্ডল ১, সূক্ত ১৬৪) আধ্যাত্মিক ভাষ্য করেছেন।

(৫) আনন্দতীর্থ (বি. ১২৫৫-১৩৩৫) ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলের ৪০ সূক্তের আধ্যাত্মিক ভাষ্য করেছেন।

(৬) সায়ণাচার্য্য (বি. ১৩৭২-১৪৪২) সম্পূর্ণ ঋগ্বেদের (বালখিল্য ছেড়ে) অধিযাজ্ঞিক, কোথাও কোথাও আধ্যাত্মিক ভাষ্য করেছেন। ইনি অন্য বেদেরও উক্ত পদ্ধতিতে ভাষ্য করেছেন।

(৭) উব্বট (বি. ১১০০) যজুর্বেদের কর্মকান্ডপরক ভাষ্য করেছেন।

(৮) মহীধর (বি. ১৬৪৫) যজুর্বেদের ভাষ্য আধিযাজ্ঞিক প্রক্রিয়াতে করেছেন।

(৯) ভরত স্বামী (বি. ১৩৬০) সামবেদের কর্মকান্ডপরক, কোথাও কোথাও আধ্যাত্মিক ভাষ্য করেছেন।

(১০) অর্থববেদের উপর কেবল আচার্য্য সায়ণের (বি. ১৪ শতাব্দী) ভাষ্যই উপলব্ধ হয়। এতে আচার্য্যসায়ণ জাদু-টোটকা, কৃত্যা, অভিচার (হিংসা) ইত্যাদিরও বর্ণনা করেছেন। এতে অর্থববেদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবর্তে অন্ধবিশ্বাসের গ্রন্থ প্রমাণিত হয়।

এই সমস্ত বিদ্বান ১৫০০ বছরের মধ্যে নূতন। মনে হয় এইসব বিদ্বানদের উদ্দেশ্য ছিল কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা করা। স্বামী দয়ানন্দ ঋষিকোটির বিদ্বান যোগী ছিলেন। তাঁর যুগে ঋষিদের গ্রন্থের উপেক্ষা হয়ে গিয়েছিল। বেদের পড়াশুনা প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্যাকরণ-সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদিতেও ঋষিকৃতগ্রন্থের উপেক্ষা হয়েছিল। পন্ডিতদের মধ্যে অনার্য, কোথাও কোথাও দোষপূর্ণ পাখন্ডী, পক্ষপাতী গ্রন্থের পঠন-পাঠন তীব্র গতিতে পূর্ণগতিতে চলছিল। এতে বড় দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক পরিণাম হয়ে উঠে। ঋষিদের গ্রন্থের পঠন-পাঠন হচ্ছিল না। এই ঐতিহাসিক পরিবেশে এই বিদ্বানেরা এই ভাষ্য করেছেন। বাস্তবিক সত্যার্থের জায়গায় হিতে-বিপরীত করে এই বিদ্বানেরা নিজের নিজের সাম্প্রদায়িকতা এবং মান্যতার পোষণ বেদমন্ত্রের দ্বারা করার প্রয়াস করেছেন। স্বামী

দয়ানন্দ এই পরিস্থিতি দেখে বেদের সত্যার্থ করার জন্য বেদভাষ্য করেছেন। তিনি কর্মকান্ডের সঙ্গে অধ্যাত্ম, পরিবার-ব্যবহার, পতি-পত্নী, মাতা-পিতা, সন্তানের সম্বন্ধ, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান আদির উপদেশ বেদে প্রকাশ করেছেন। উনি নিজের গ্রন্থ 'ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা'-তে অনেক শুদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক শীর্ষক অধ্যায় লিখেছেছন। কিছু অধ্যায়, বিষয়ের নাম নিম্নপ্রকার— (১) সৃষ্টি উৎপত্তি বিদ্যা, (২) আকর্ষণানুকর্ষণ (GRAVITATION) (৩) গণিতবিদ্যা, (৪) বিমানবিদ্যা আদি, (৫) তারবিদ্যা, (৬) বৈদ্যক, (৭) ঔষধ বিজ্ঞান, (৮) রাজাপ্রজাধর্ম-রাজনীতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেদে গণিত

স্বামী দয়ানন্দ উপরোক্ত অনেক ধরনের বিষয়ের বর্ণনা বেদে দেখিয়েছেন। অঙ্ক গণিত, জ্যামিতি আদি হল শুদ্ধ বিজ্ঞানের বিষয়। স্বামীজী বেদ থেকে কিছু কিছু মন্ত্রকে উদ্ধৃত করেছেন—যজুর্বেদের অধ্যায় ১৮-র মন্ত্র ২৪ দ্রষ্টব্য—

"একা চ মে তিস্রশ্চ মে তিস্রশ্চ মে পঞ্চ চ মে পঞ্চ চ মে সপ্ত চ মে সপ্ত চ মে নব চ মে...একত্রিংশচ্চ মে এক ত্রিংশচ্চমে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্।"

এই মন্ত্রে অংকের উপদেশ তো রয়েছেই, সাথে সাথে শৃঙ্খলা অংকগণিতীয় শ্রেণীও রয়েছে। এতে দুই অংকের মধ্যে সমান অন্তর হয়—দেখানো হয়েছে। ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩—২৭, ২৯, ৩১, ৩৩ এতে সমান অন্তর রয়েছে (১ + ২ = ৩), (৩ + ২ = ৫), (৫ + ২ = ৭) আদি।

এই ধরনের আর দুই'র একটি নামতাও দেখুন—**"চতস্রশ্চ মেঽ ষ্টৌচ মেঽ ষ্টৌ চ মে দ্বাদশ চ মে দ্বাদশ চ মে ষোড়শ চ মে ষোড়শ চ মে... চত্বারিংশচ্চ মে চতুশ্চত্বারিংশচ্চ মে চতুশ্চত্বারিংশচ্চ মেঽ ষ্টাচত্বারিংশচ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্।"** (যজু. ১৮/২৫) ৪, ৮, ১২, ১৬, ২০......৩৬, ৪০, ৪৪, ৪৮। (চার এর নামতা)

উক্ত মন্ত্রে নামতা তো রয়েছে কিন্তু একটি বিশেষতা রয়েছে। আমরা নামতা ১০র গুণন পর্যন্ত করি যেমন ৪, ৮, ১২, ১৬....৩৬, ৪০, (৪ × ১০) কিন্তু বেদ মন্ত্রে ১২র গুণন পর্যন্ত রয়েছে—৪, ৮, ১২, ১৬...৪০, ৪৪, ৪৮।

স্বামী দয়ানন্দ তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা'তে নৌকা-জলযান-বায়ুযান আদির নির্মাণ কে মূলরূপে বেদমন্ত্রে দেখিয়েছেন। যখন স্বামী দয়ানন্দের এই ঘোষণার প্রচার ব্যাপকরূপে বিদ্বানদের সম্মুখে

হতে লাগল তখন বিদ্বানদের ধ্যান বেদে নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হল। বিগত শতাব্দীতে আর্য্য সমাজের বিদ্বানেরা এবং সমাজের বাইরের ভারতীয় বিদ্বান এবং অভারতীয় বিদ্বানেরা গণিত, রসায়ন, ভৌতিকী, ভূগর্ভ, ভূগোল, খগোল, জ্যোতিষ আদি অনেক বিদ্যাকে বেদের আধারে প্রচারিত করেছেন।

বেদে যোগ

কিছু কিছু বিদ্বান্ যোগবিদ্যাকে বেদের পরবর্তীকালে (POST VEDIC PERIOD) হয়েছে বলে থাকেন। স্বামী দয়ানন্দ যজুর্বেদের অধ্যায় ১১র অনেকগুলি মন্ত্রকে যোগবিদ্যার বীজরূপে প্রস্তুত করেছেন। বিদেশের অনেক বিদ্বান্ তাঁদের নিজ নিজ শোধ প্রকল্পে বেদ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজরূপকে পল্লবিত করে স্বামী দয়ানন্দের স্থাপনাকে সত্য প্রমাণিত করে চলেছেন।

বেদে ভূগোল খগোল ঃ মধ্যকালে সমস্ত সেমেটিক মত পন্থ, ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান সবাইয়ের মান্যতা ছিল যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য চলছে। ভারতবর্ষের সমস্ত মতপন্থও পৃথিবীকে স্থির এবং সূর্য্য ১২টি ঘোড়ার রথে উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্য্যন্ত যাত্রা প্রতিদিন পূর্ণ করে—এইরকম মানত। বেদশাস্ত্রের ভিত্তিতে স্বামী দয়ানন্দ প্রমাণিত করলেন যে পৃথিবী, সূর্য্য এবং গ্রহ উপগ্রহ সমস্ত আকাশে ভ্রমণ করতে থাকে। আকাশে কোন পিন্ড স্থির গতিহীন থাকতে পারে না। উনি লিখেছেন—"এখন সৃষ্টিবিদ্যা বিষয়ের পরে পৃথিবী আদিলোক ঘুরছে না—এই বিষয়ে লেখা হচ্ছে। এতে সিদ্ধান্ত হল যে, বেদশাস্ত্রের প্রমাণ এবং যুক্তিতেও পৃথিবী এবং সূর্য্য আদি সব লোক ঘুরছে। এই বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে।"

"আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রয়ন্ত স্বঃ।
(যজু-৩। ৬)

"(আয়ং গৌঃ) গৌ নাম হল পৃথিবী, সূর্য্য চন্দ্রমাদি লোকের। গচ্ছতি প্রতিক্ষণং ভ্রমতি যা সা গৌঃ পৃথিবী। এরা সব নিজের নিজের পরিধিতে, অন্তরিক্ষের মধ্যে সর্বদা ঘুরতে থাকে। 'অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী। জল হল পৃথিবীর মা। কেননা পৃথিবী জলের পরমাণুগুলির সাথে নিজের পরমাণুগুলির সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে। সূর্য্য তাঁর পিতাতুল্য, এইজন্য সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরতে থাকে। এইভাবে সূর্য্যের পিতা বায়ু এবং আকাশ মাতা তথা চন্দ্রমার অগ্নি পিতা এবং জল মাতা। তাঁদের চারধারে ওরা ঘুরতে থাকে। এইভাবে সমস্ত লোক নিজের নিজের কক্ষতে ঘুরতে থাকে।"

"এই বিষয়ের প্রমাণ সংস্কৃতে নিঘন্টু এবং নিরুক্তে লেখা রয়েছে—তাতে দেখে নিও। এইরকম সূত্রাত্মা যে বায়ু, তাঁর আধার এবং আকর্ষণ

থেকে সব লোকের ধারণ এবং ভ্রমণ হয়। তথা পরমেশ্বর নিজের সামর্থ্য থেকে পৃথিবী আদি সব লোককে ধারণ, ভ্রমণ এবং পালন করে চলেছেন।"

উপরোক্ত অনেক প্রমাণ স্বামীজী লোক-লোকান্তর, গ্রহ-উপগ্রহের ভ্রমণের বিষয়ে দিয়েছেন।

স্বামী দয়ানন্দ বেদভাষ্য কেন করেছেন?

বেদ হল পরমেশ্বর প্রদত্ত এবং শুরুতে বেদের অধ্যাপক, আচার্য্য বেদ পড়ানোর জন্য গ্রন্থান্তরের প্রয়োগ করতেন না। পরে বেদের অর্থকে বোঝার জন্য বেদের শাখাগুলিতে পাঠগুলিকে কোথাও কোথাও সরল শব্দ দিয়ে সুগম করা হয়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহতেও এক ধরনের বিশেষ প্রকারের বেদের উপক্রম উপলব্ধ হয়। নিঘন্টুতে বেদের কিছু শব্দের পর্যায় সংগ্রহ রয়েছে। নিরুক্ত পদ্ধতি থেকে বেদার্থকে সুস্পষ্ট বোধগম্য করার জন্য মহত্ত্বপূর্ণ যোগাদান হয়েছে। ব্যাকরণ শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি বলে দেয় এবং নিরুক্ত ব্যাখ্যা পদ্ধতির নির্দেশ করে। এই সমস্ত প্রয়াস বেদকে সুগম বোধগম্য করতে সহযোগী ছিল। কিন্তু ঐ সব ভাষ্য নয়। এতে ক্রমশঃ সমস্ত মন্ত্রের পদ-পদার্থ, অন্বয়, ব্যাখ্যা আদি উপলব্ধ হয় না। স্বামী দয়ানন্দ বেদভাষ্য তো করেছেনই, বেদের ভাষ্যের মার্গ দেখিয়েছেন। **মধ্যকালের ভাষ্য ঃ** মধ্যকাল বিক্রমের সপ্তমশতাব্দী এবং আচার্য্য সায়ণ বি.-র ১৪ শতকের মধ্যে অনেক ভাষ্যকার হয়েছেন। কিন্তু সায়ণকে বাদ দিয়ে কেউ-ই সম্পূর্ণ একটি বেদেরও ভাষ্য করেননি। স্কন্দস্বামী, উদ্গীথ, ভেংকট মাধব, আত্মানন্দ, আনন্দতীর্থ সবাই ঋগ্বেদের কিছু-কিছু অংশের ভাষ্য করেছেন। সায়ণাচার্য্য (বি. ১৩৭২) ১৪৪২ ঋগ্বেদ, (বালখিল্য কে বাদ দিয়ে) যজুর্বেদ (কণ্বশাখা) সামবেদ এবং অথর্ববেদ—চারটিই বেদের উপর ভাষ্য করেছেন। ইনি বিশেষতঃ অধিযাজ্ঞিক, পশুযাগ, অশ্বমেধ, গোমেধ, ইতিহাস, সাম্প্রদায়িক ভাষ্য করেছেন। আচার্য্য উব্বট (বি. ১১০০) এবং আচার্য্য মহীধর (বি. ১৬৪৫) দুজনেই যজুর্বেদ বাজসনেয়ী শাখার ভাষ্য করেছেন। এসব ভাষ্যও কর্মকাণ্ডপরক, পশুবধ, অশ্বমেধ, গোমেধ, সাম্প্রদায়িক মান্যতার ভাষ্য। সামবেদের উপর ভরতস্বামী (বি. ১৩৬০) ভাষ্য করেছেন। অভিপ্রায় হচ্ছে যে, পিছনের সাতশত বছরের অনেক বিদ্বানের বেদভাষ্য প্রায় আংশিক। আরও একটি তথ্য ধ্যান দেওয়ার যোগ্য যে ভাষ্যকার হলেন প্রায় দাক্ষিণাত্য যাঁদের মধ্যে বিদেশীবংশের মিশ্রণ হয়েছে যাঁরা নিজেদের সাথে পশুবলির সংস্কার ধারণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থ থেকে শুরু করে ভাষ্য পর্যন্ত সারা মিশ্রণ এরই

ফল বলে মনে হয়। তীব্র দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে না কিন্তু পশুবধ, মাংস, মদ আদির সমর্থন বিদেশীদের রক্তমিশ্রণের ফল বলে মনে হয়।

ভাষ্য এবং ভাষ্যকারদের এই পৃষ্ঠভূমিতে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন হচ্ছে যে এতসব ভাষ্য হওয়া সত্ত্বেও স্বামী দয়ানন্দ বেদভাষ্য করার জন্য এতো পরিশ্রম কেন করেছিলেন? এই প্রশ্ন স্বামীজী নিজেই তুলেছেন। বেদভাষ্যের পূর্বে উনি পরমবৈদুষ্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ লিখেছেন—"ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা। এতে উনি এক অধ্যায়ে লিখেছেন—"অথ সংক্ষেপতো ভাষ্করণ শংকা সমাধান বিষয়ঃ।"—সেখানে তিনি নিজেই এই প্রশ্ন তুলেছেন—

"কেন শ্রীমান্! তুমি যে এই বেদের ভাষ্য করতে চলেছ, তা পূর্ব আচার্য্যদের ভাষ্যের মতো বা নবীন? যদি পূর্বরচিত ভাষ্যের মতো হয় তাহলে তো ভাষ্য করা ব্যর্থ, কেননা সেতো পূর্বেই করা হয়ে রয়েছে। আর যদি নূতন করতে চাইছ তাহলে তাকে কেউ মানে না। কেননা, যে বিনা প্রমাণে কেবল নিজের কল্পনাতে তৈরি করবে—একথা কখনও ঠিক হতে পারে?"

এই ধরনের সম্ভাবিত সমস্ত পক্ষগুলিকে উত্থাপিত করে স্বামীজী নিজেই উত্তর পক্ষও প্রস্তুত করেছেন—

"এই ভাষ্য প্রাচীন আচার্য্যদের ভাষ্যের অনুকূল করা হচ্ছে। পরন্তু যা রাবণ, উব্বট, সায়ণ এবং মহীধর আদি ভাষ্য করেছেন, তাঁরা সব মূলমন্ত্র এবং ঋষিকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ। আমি সেই ধরনের ভাষ্য করছি না। কেননা তাঁরা বেদের সত্যার্থতা এবং অপূর্বতা কিছুই জানতেন না। এবং এটা আমার যে ভাষ্যটি হচ্ছে সে তো বেদ বেদাঙ্গ, ঐতরৈয়, শতপথ ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের অনুসারে হচ্ছে। কেননা যা যা বেদের সনাতন ব্যাখ্যা, সে সব প্রমাণের দ্বারা যুক্ত করা হচ্ছে—এটি হল এর অপূর্বতা...এবং দ্বিতীয়তঃ এর অপূর্ব হওয়ার কারণ এইটি যে এতে কোন কথা অপ্রমাণ বা ব্যক্তিগত নিজের রীতিতে লেখা হয় না এবং যে যে ভাষ্য সায়ণ, উব্বট, মহীধরাদি করেছেন, সে সব মূলর্থ এবং সনাতন বেদ ব্যাখ্যা রিরুদ্ধ। তথা যে যে এই নবীন ভাষ্যের অনুসারে ইংরেজি, জার্মানী, দক্ষিণী এবং বাংলাভাষা আদিতে হয়েছে, তারাও হল অশুদ্ধ।

"যেমন দেখো—সায়ণাচার্য্য বেদের শ্রেষ্ঠ অর্থকে না জেনে বলেছেন যে—সমস্ত বেদ ক্রিয়াকান্ডের-ই প্রতিপাদন করে। এটি তাঁর মিথ্যা কথা। এর উত্তর যা কিছু এই ভূমিকার পূর্ব প্রকরণে লিখেছি—তাকে দেখে নিও।"

স্বামী দয়ানন্দজী মহীধরের যজুর্বেদের ভাষ্যের উপরেও এই প্রকার টিপ্পনী করছেন যে মহীধরও যজুর্বেদের উপর মূল থেকে অত্যন্ত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করেছেন। তার থেকে সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য তাঁর কিছু দোষ দেখানো হচ্ছে—

মহীধরাচার্য্য যজুর্বেদের "গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে...ত্বমজাসি গর্ভধম্" (যজু. ২৩.১৯) এই মন্ত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে বিনিয়োগই করেননি, অপিতু রাজার রানী ঘোড়ার সাথে সম্ভোগ করুক এবং ঘোড়ার বীর্য টেনে নিয়ে যোনিতে ধারণ করুক। বর্ণনার নগ্নতা—অশ্লীলতাকে বাঁচানোর জন্য আমরা খুব প্রযত্ন করেছি। এই প্রকার অনেক যন্ত্রে মহীধর অশ্লীলতাতে পরিপূর্ণ নির্লজ্জতার ইতি করে দিয়েছেন।

স্বামী দয়ানন্দ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণ প্রস্তুত করে এই মন্ত্রের পরমেশ্বর পরক এবং রাজধর্মপরক ভাষ্য করেছেন। স্বামীজী উপসংহার রূপে লিখেছেন—

"এই কার্য্য ঐতরেয়, শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে। বিচার করা উচিৎ যে এই সত্য অর্থের লুপ্ত হওয়ায় মানুষকে ভ্রমিত করে বেদকে কতখানি অপমান করা হয়েছে—যেভাবে এই দোষ খন্ডিত হয়েছে ঠিক সেভাবে এই ভাষ্যের প্রবৃত্তি থেকে সেই দোষের নিবৃত্তি হয়ে যাবে।"

কথা আখ্যানগুলির বৈদিক স্বরূপ ঃ

কিছু আখ্যানের সূত্র মূলরূপে বেদ সংহিতাতে পাওয়া যায়। বামমার্গী তন্ত্রগ্রন্থে এবং পুরাণ গ্রন্থ ব্রহ্মাবর্ত ভাগবৎ আদিতে শৃংগার প্রধানযুগে বামমার্গী, শৈবশাক্ত, ভাগবৎ আদি পৌরাণিক গ্রন্থে সেইসব কথাগুলির অত্যন্ত অশ্লীল, লজ্জাস্পদ, ভ্রষ্ঠ নগ্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আচার্য্য সায়ণ এবং মহীধর আদি সাম্প্রদায়িক তান্ত্রিক বিদ্বানেরা নিজেদের বেদভাষ্যে তাকে পল্লবিত করেছে। ইউরোপের খ্রীষ্টান মিশনারী বিদ্বানেরা সেই কথাগুলিকে আরও প্রকাশিত করেছে। সাথেই বেদ-ঋষিদের, ভারতীয় পরম্পরাগুলির নিন্দাত্মক ব্যাঙ্গকরেছে এবং বৈদিক সংস্কৃতি এবং বৈদিক কালের ঐতিহাসিকতার লজ্জাস্পদ পরম্পরাগুলি থেকে পরিপূর্ণ বর্ণনা প্রচারিত করেছে। স্বামী দয়ানন্দ বৈদিক মূল এবং স্বরূপের সত্যার্থপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছেন। এক-দুটির উদাহরণ দ্রষ্টব্য ঃ—

ঋগ্বেদে মন্ত্র আসে—(১) **দ্যৌর্মে পিতা জনিতা...পিতা দুহিতুর্গর্ভমাদধাৎ॥** (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৩৩) এই কথা রূপক অলংকারে ছিল—এখানে প্রজাপতি বলছেন সূর্য্যকে, যার দুইটি কন্যা—একটি হল প্রকাশ, দ্বিতীয়টি হল উষা। কেননা যে যার থেকে উৎপন্ন হয়, সে তারই সন্তান হয়। এইজন্য উষা যে নাকি তিন চার ঘন্টা রাত্রি অবশেষ থাকায় পূর্ব দিকে লালিমাযুক্ত দেখা যায়, সে সূর্য্যের কিরণে উৎপন্ন হওয়ার কারণে তারই কন্যা হয়। তার থেকে উষার সম্মুখে যে প্রথম সূর্য্যকিরণ গিয়ে পড়ে, সেইটাই বীর্য্যস্থাপন (তেজস্থাপন)-র সমান। তাদের দুজনের সমাগমে পুত্র অর্থাৎ দিবস উৎপন্ন হয়।"

স্বামীজীর এই ব্যাখ্যা হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প. ৩, কন্ডিকা. ৩৩-৩৪র

আধারের উপর। (২) **"পিতা দুহিতুর্গর্ভমাদধাৎ॥"** (স-১-১৬৪-৩৩)—এই রূপক অলংকার যুক্ত কাহিনীর নিরুক্তে ব্যাখ্যাকে স্বামীজী প্রস্তুত করেছেন—

"তত্র পিতা দুহিতুর্গর্ভম্ দধাতি পর্জন্যঃ পৃথিক্যাঃ" (নিরক্ত ৪। ২১)নিরুক্তে রূপকালংকারের কাহিনী লেখা আছে যে—পিতার সমান পর্জন্য অর্থাৎ জলরূপ যে মেঘ, তাঁর পৃথিবীরূপ দুহিতা অর্থাৎ কন্যা। কেননা পৃথিবীর উৎপত্তি জল থেকেই। যখন সে সেই কন্যা (পৃথিবী)-তে বৃষ্টি দ্বারা জলরূপ বীর্য্যকে ধারণ করে তখন তাঁতে গর্ভ হয়ে ঔষধি আদি অনেক পুত্র উৎপন্ন হয়।"

(৩) ইন্দ্র এবং অহল্যার জারকর্মের কাহিনীতে খুব প্রচার হয়ে থাকে। অহল্যা গৌতমের স্ত্রী ছিল। ইন্দ্র দেবরাজ অহল্যার সাথে জারকর্ম করে। গৌতম জানতে পারে এবং সে দুইজনকে অভিশাপ দেয়। দেবরাজ ইন্দ্রকে এই অভিশাপ দিল যে তোর শরীরে সহস্র ভগ হয়ে যাক এবং অহল্যাকে অভিশাপ দিল যে তুই পাথর হয়ে যা। দুইজনেই শাপমোচনের জন্য গৌতমকে অনেক অনুনয় বিনয় করল। গৌতম দেবরাজ ইন্দ্রকে সহস্রভগের জায়গায় সহস্রনেত্র হয়ে যাওয়ার অনুগ্রহ করে দিল এবং অহল্যাকে বলল যে যখন শ্রীরামের চরণস্পর্শ তোমার হবে তখন তুমি শাপমুক্ত হয়ে যাবে।

এই কাহিনীতে ইন্দ্র আদিত্য হল সূর্য্য—**আদিত্যোঽত্রজার উচ্যতে, রাত্রের্জরয়িতা॥** (নিরুক্ত ৩। ১৬) এষ এবেন্দ্রো য এষ তপতি॥ (শতঃ ১-৬-৪-১৮) **রাত্রিরহল্যা। কস্মাদহর্দিনং লীয়তেঽস্যাং, তস্মাদ্ রাত্রিঃ অহল্যা উচ্যতে। স চন্দ্রমাঃ সর্বাণি ভূতানি প্রমোদয়তি, স্বস্ত্রিয়া অহল্যয়া সুখয়তি।**

স্বামী দয়ানন্দ লিখেছেন যে এই কাহিনীকে পুরাণে বিকৃত করে লেখা হয়েছে। সত্য গ্রন্থে এইরকম নাই।

ওতে এই রীতিতে আছে—

"সূর্য্যের নাম ইন্দ্র, রাত্রির অহল্যা তথা চন্দ্রমার নাম হল গৌতম। এখানে রাত্রি এবং চন্দ্রমার স্ত্রী-পুরুষের সমান রূপক-অলংকার রয়েছে। চন্দ্রমা নিজের স্ত্রী রাত্রির দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে আনন্দ করায় এবং সেই রাত্রির জার হল আদিত্য অর্থাৎ যার উদয়ের কারণে রাত্রি অন্তর্ধ্যান হয়ে যায় এবং জার অর্থাৎ এই সূর্য্যই রাত্রির রূপশৃঙ্গারকে খারাপ এবং বিকৃত করে দেয়। এইজন্য এই স্ত্রী-পুরুষের রূপক-অলংকার বাঁধা হয়েছে যে যেমন স্ত্রীপুরুষ মিলেমিশে থাকে ঠিক তেমনি চন্দ্রমা এবং রাত্রিও সাথে সাথে থাকে। চন্দ্রমার নাম গৌতম এইজন্য যে, সে অত্যন্ত বেগের সাথে চলে। এবং রাত্রিকে 'অহল্যা' এইজন্য বলে যে তাতে দিন লয় হয়ে যায় তথা সূর্য্য রাত্রিকে নিবৃত্ত করে দেয়, এইজন্য এ তার 'জার' বলে কথিত হয়।

এর শুদ্ধ-শ্লীল অর্থ লিখে স্বামীজী লিখেছেন যে—"এই উত্তম রূপকালংকার বিদ্যাকে অল্পবুদ্ধি পুরুষেরা বিকৃত করে সমস্ত মানুষকে হানিকারক ফল ধরে দিয়েছে।

স্বামী দয়ানন্দজী অনেক পৌরাণিক কাহিনীর প্রাচীন শাস্ত্রানুমোদিত রূপকে প্রস্তুত করেছেন। উনি বিকৃত পৌরাণিক মিথকীয় (মিথ্যা) স্বরূপকে ত্যাগ করে প্রাচীন স্বরূপের পক্ষধর ছিলেন।

উপসংহার

স্বামী দয়ানন্দের নিশ্চিতরূপে সুচিন্তিত মান্যতা হল যে বেদ অপৌরুষেয়। বেদজ্ঞান পরমেশ্বর প্রদত্ত। বেদ সব সত্যবিদ্যার পুস্তক। বিশ্বে যতসব সত্যবিদ্যা আছে, সবার উপদেশ বীজরূপে বেদে বিদ্যমান রয়েছে। বেদে পার্থিব বিদ্যা আছে, সামাজিক বিদ্যা বা আধ্যাত্মিক বিদ্যাও রয়েছে। সেই সবাইয়ের বীজরূপে উপদেশ পরম কৃপালু পরমেশ্বর সংসারের কল্যানের জন্য বেদে করে দিয়েছেন। সেই বীজরূপ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ করা জ্ঞানকে পল্লবিত করা, পুষ্পিত করা, বিশ্বের কাছে উপযোগী করে তোলা মন্ত্রদ্রষ্টা, আপ্তবক্তা, ঋষিদের করণীয় কর্তব্য। তাঁর ব্রাহ্মণগ্রন্থ, আরণ্যক, উপনিষদ, সূত্রগ্রন্থ আদির দ্বারা এই জ্ঞানকে বিদ্বানদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। মহাভারতে সর্বনাশী যুদ্ধ বেদবিদ্যার ভারী ক্ষতি করে দিয়েছিল। আজ আমাদের যুগে যা কিছু কম-বেশী মন্ত্রের ভাষ্য উপলব্ধ রয়েছে, তা সবই বিক্রমের সাত শতাব্দীর পরের। এর অর্থ হল যে সমস্ত উপলব্ধ ভাষ্য এক হাজার বছরের ভিতরের। স্বামী শংকরাচার্য্য প্রায় ২৩-২৪ শত বছর পূর্বে হয়েছিলেন। এইরকম প্রকান্ড বিদ্বান সর্বাত্মা সমর্পিত ধর্মোদ্ধারকের সম্পূর্ণ ভাষ্যাত্মক সাহিত্য 'প্রস্থানত্রয়ী' শ্রীমদ্ভগবৎগীতা, উপনিষদ এবং বেদান্ত দর্শন উপলব্ধ আছে। উনি বেদভাষ্য করেন নি অথবা এরকম বলা যেতে পারে যে উনি গীতা, উপনিষদ এবং বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য পর্য্যন্তই থেকে গেছেন। অতি ছোট আয়ুর্বল, তাঁর উপর বৌদ্ধদের সাথে শাস্ত্রার্থ এতেই তাঁর সারা জীবন লেগে গেছে। শাংকর ভাষ্য সাহিত্যে এক তথ্য চমকিয়ে দেওয়ার মতো—সেটা হল যে শ্রুতির নামে উদ্ধৃত প্রমাণগুলিতে বেদের প্রমাণ অত্যন্ত কম, প্রায় না থাকারই মতো। আপাততঃ এটাই মনে হয় যে যজ্ঞ-সংস্কার-বিনিয়োগ থেকে পৃথক বেদের উপযোগ প্রশস্তিপাঠেরই জন্য থেকে গিয়েছিল। যদ্যপি বেদের মহিমা নির্ভ্রান্তরূপে সেই সময়েও স্বীকার্য ছিল—

(১) **বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্॥** মনু ২.৬ অর্থাৎ চার বেদ ঋগ্, যজুঃ, সাম

এবং অথর্ব হল ধর্মের মূল। (২) **ধর্ম জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতি॥** (মনু ২-২৩) অর্থাৎ ধর্মকে জানার ইচ্ছাকারীদের জন্য বেদ হল পরম প্রমাণ॥ (৩) **নিসৃতং সর্বশাস্ত্রং তু বেদ শাস্ত্রাৎ সনাতনাৎ॥** যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি—অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্র সনাতন বেদ থেকেই হয়েছে। (৪) মহাত্মা গৌতমবুদ্ধ বেদের নামে পশুহিংসা, বলি ইত্যাদির বিরোধ করেছিলেন কিন্তু বেদের সম্বন্ধে তাঁর বিচার ছিল প্রশস্ত—**"বিদ্বাংশ্চ বেদৈঃ সমেত্য ধর্মং, নোচ্চাবচং গচ্ছতি ভূরিপ্রজ্ঞঃ।"** (সুত্তনিপাত ২৯২র সংস্কৃত অনুবাদ)—অর্থাৎ যে ভূরিপ্রজ্ঞ বিদ্বান্ বেদ থেকে ধর্ম প্রাপ্ত করে সে কখনও নীচে উপরে দোদুল্যমান হয় না।

এটুকু তো সরলভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বেদের মহিমা তো সবাই গাইত কিন্তু বিদ্বানদের মন্ডলী বেদকে ভুলে বসেছিল বা ভুলিয়ে দিয়েছিল। দুই-চারজন আচার্য্য যে চেষ্টা আচার্য্য সায়ণের পূর্বে করেছিলেন তা অল্প থেকেও অল্প ছিল। বিক্রমের ১৪ শতাব্দীতে বুক্ক নরেশ আচার্য্য সায়ণকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং উনি নিজের সম্প্রদায়ের অনুরূপ চারটি বেদের উপর ভাষ্য করেছিলেন। কিন্তু তখনও বেদের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়নি।

মুসলমানদের শাসনকালে ধর্ম এবং সংস্কৃতির দৃষ্টিতে এবং সংস্কৃত পঠন-পাঠনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিষমতার দিন ছিল। অনেক শত বছর পর্য্যন্ত আর্য্যদের মাথার উপর ধার্মিক বিরোধের উদ্দন্ড অত্যাচারী শাসন তলোয়ারের বলে চলছিল। আশ্চর্য্য, সুখদ আশ্চর্য হল এই যে, আর্য্য সভ্যতা-সংস্কৃতির জিজীবিষা এতখানি বলবতী সিদ্ধ হয়েছিল যে বর্বর-নিষ্ঠুর-আততায়ী শাসন তাকে মারতে পারে নি। তা সত্ত্বেও যেমন তেমন করে সংস্কৃত বিদ্যা তো বেঁচে রইল কিন্তু বেদবিদ্যা লুপ্তপ্রায় হয়ে গেল। অল্পখানি মন্ত্র কর্মকান্ডের জন্য মুখস্থ হতে লাগল, অল্প দাক্ষিণাত্য বেদপাঠী কিছু ব্রাহ্মণ বেদ কণ্ঠস্থ করে চলেছিল কিন্তু মুখস্থই হতে থাকলো, বিধিপূর্বক অধ্যয়ন-অধ্যাপন সব শিথিল হয়ে গেল, সমাপ্তপ্রায় হয়ে গেল।

খ্রীষ্টান শাসক মুসলমানদের মতো বর্বর উদ্দন্ড জঙ্গলী তো প্রমাণিত হয়নি কিন্তু চাতুর্য্য চালাকিতে পুরা ওস্তাদ ছিল। উপর উপর দেখলে যতটা কার্য্য বৈদিক সাহিত্যের উপর ইউরোপের বিদ্বানেরা সামান্যরূপে এবং ইংরেজ বিদ্বানেরা বিশেষরূপে করেছে তা যদি শুদ্ধবিদ্যার দৃষ্টিতে হত তা অবশ্যই প্রশংসনীয় হত কিন্তু দুর্ভাগ্য হল যে অনেক কার্য্য ভারতীয় সংস্কৃতিকে এরূপে প্রদর্শিত করার নিহিত স্বার্থে প্রেরিত ছিল যে ভারতবাসীদের তাঁদের নিজেদের ধর্ম থেকে ঘৃণা হয়ে যায়, সবাই খ্রীষ্টানধর্ম স্বীকার করে নিক এবং ভারতে ইংরেজদের রাজ্যের আধার শিলা দৃঢ় হয়ে যায়।

এই সমস্ত রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থে প্রেরিত, বিদ্যার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত নিকৃষ্ট যোজনার নিকটতম এবং সুদৃঢ়তম পরিণাম এই হল যে ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত ভারতের রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির উদ্ধারক ভক্ত-বিদ্বানও বেদের প্রতি উপেক্ষার ভাবনা রাখতে লাগল। এই সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের একটিই উদাহরণ তাৎকালিক ভারতীয় মানসিকতার নিদর্শন হতে পারে। মোক্ষমূলর তাঁর নিজের জীবনীর রচনাতে (Biographical Essays) একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রফেসার মোক্ষমূলর লিখেছেন—"The Raja (Ram Mohan Roy) was in London and he saw Friedrich Rosen at the British Museum busily engaged in copying manuscripts of the Rigved. The Raja was surprised and told Rosen that he ought not to waste his time on Hymns but he should study the Upanishads."—অর্থাৎ রাজা রামমোহন লন্ডনে ছিলেন। উনি দেখলেন যে ফেড্রিক রোজন ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে প্রতিলিপি করাতে ব্যস্ত ছিলেন। রাজা আশ্চর্য্য হলেন এবং উনি রোজনকে বললেন যে আপনাকে মন্ত্রের উপর সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়, আপনাকে উপনিষদের অধ্যয়ন করা উচিৎ (দ্রষ্টব্য-'বেদোঁ কা যথার্থ স্বরূপ', লেখক-প. ধর্মদেব বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যামার্তন্ড পৃষ্ঠ-৪৬)। এতো সহজেই বোঝা যায় যে যখন রাজা রামমোহনের মতো রাষ্ট্রভক্ত, সংস্কারকের এইরকম ভাবনা ছিল তাহলে সহজ সরল আজীবিকার্থী পন্ডিত তো বেদের মহত্ত্ব থেকে বিরতই থাকবেন।

থাকলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা বিদ্বানদের কথা, তাঁদের তো নিজেদের উপর অধিকারীর ধ্যান রাখা স্বাভাবিকই। তাঁদের তো পাঠ্যপুস্তকও নির্ধারিত হয় এবং সেইসব পুস্তকের বিষয়বস্তুও নিশ্চিত থাকে। অতঃ তাঁদের ধারণা তো প্রায়ঃ সেইটাই ছিল যা ইংরেজ বিদ্বান শিখাচ্ছিলেন। সমগ্ররূপে বেদবিদ্যার সুষ্ঠ প্রচার কোথাও হচ্ছিল না।

এই সম্বন্ধে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃদেব) তাঁর আত্মচরিত্রে লিখেছেন—"The Vedas were virtually extinct in Bengal. Nyaya and Smriti Shastras were studied in every tol (small school teching only Sanskrit) and many Pandits versed in these shastras came forth thence, but the Vedas were totally ignored."—অর্থাৎ বেদ বাংলা থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত পাঠশালাগুলিতে ন্যায়শাস্ত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্র পঠন, পাঠন চলত। এই শাস্ত্রে নিপুণ অনেক বিদ্বান উপলব্ধ হতেন কিন্তু বেদের সর্বদা উপেক্ষা করা হত।

এ তো হল বাংলা (দেশ)-র স্থিতির বর্ণনা। বাকী ভারতবর্ষেরও প্রায় এইরকমই স্থিতি ছিল। কাশীকে বিশ্বনাথের পুরী বলা হয়। এ হল সংস্কৃত বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিশ্ববিশ্রুত কেন্দ্র। এখানেও ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা ইত্যাদিরও অধ্যয়ন-অধ্যাপন চলতো। বিধিপূর্বক বেদ-নিরুক্ত-ব্রাহ্মণগ্রন্থকে পড়ার মতো কেউই ছিল না, না পড়ানোর কেউ ছিলেন উপর থেকে কখনও-কখনও কর্মকান্ডী বিদ্বানদের অনভিজ্ঞতার উপেক্ষাপূর্ণ পরিহাসও হয়ে যেত। এই ধরনের পরিবেশে স্বামী দয়ানন্দ বেদের প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। কোথাও উদাসীনতা, কোথাও উপেক্ষা, কোথাও বিরোধ দেখা দিচ্ছিল। সহযোগ কোথাও থেকে সুলভ ছিল না। বেদবিদ্যার প্রচারে সরকারও সহযোগ করছিল না। স্বামী দয়ানন্দ এ সবকিছু সহ্য করে গেলেন। বেদের প্রচারের নিশ্চয় করে নিলেন, তো আগে এগিয়ে চললেন, কখনও পিছনে ঘুরে দেখলেন না।—

থা সব জগৎ বিরোধী, ফিরভী ঋষি দয়ানন্দ।
বৈদিক ধর্ম কা ঝন্ডা ফহরা দিয়া অকেলা॥

বেদের প্রচার এমনভাবে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে বেদের পঠন-পাঠন তো অনেক দূরের কথা ছিল, বেদগ্রন্থগুলির দর্শনও দুর্লভ ছিল। পন্ডিতদের ঘরে, সংস্কৃত পাঠশালাতে, সার্বজনিক পুস্তকালয়গুলিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়-গুলিতে, কোথাও কোথাও এক-দুটি পুস্তক প্রাপ্তির সুখদ আশ্চর্য ছিল। একটি জনশ্রুতি প্রায়ঃ শোনা যেত যে রাক্ষস বেদকে চুরি করে পাতাললোকে নিয়ে গিয়েছে। এখন এই ধরাধামে কলিযুগে বেদ পাওয়া যায় না।

এই পরিস্থিতিসমূহের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ বেদ-উদ্ধারের ও প্রচারের সংকল্প নিলেন এবং আহ্বান করলেন যে, বেদের পঠন-পাঠন হল পরম ধর্ম। মনুস্মৃতিতে বেদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—**"সর্বজ্ঞান ময়ো হি সঃ"**—বেদ হল সর্বজ্ঞানময়। **"বেদো নিত্যমধীয়তাম্"**—বেদকে নিত্য পড়া উচিৎ। এই দুটিকে একসাথে সংযুক্ত করলে আর্য্যসমাজের তৃতীয় নিয়ম তৈরি হয় —"বেদ সব সত্যবিদ্যার পুস্তক। বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ-শ্রবণ করা সব আর্য্যদের পরম ধর্ম।"

স্বামী দয়ানন্দের তপস্যা, আর্য্যসমাজের বিদ্বানদের, সেঠ এবং কার্য্যকর্তাদের বেদের প্রতি সমর্পণের সুফল এটা হল যে মূল সংহিতাগুলির লক্ষ লক্ষ প্রতি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। চারবেদ একাধিক সংস্কৃত এবং হিন্দীতে, অন্য ভারতীয় ভাষাগুলিতে, ইংরাজী ভাষ্য-টীকা সুলভ হয়ে গিয়েছে।

হাজার হাজার বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়নে সমর্পিত রয়েছে এবং হয়েছে। দেশ-বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে পৃথক বিদ্বান্ বেদাধ্যয়নে রত রয়েছেন।

বেদের সম্বন্ধে স্বামী দয়ানন্দের আধারভূত কতিপয় মান্যতা নিম্নপ্রকার ঃ—

(১) বেদ হল অপৌরুষেয়, পরমেশ্বর বেদজ্ঞানের প্রেরণা দিয়েছেন। এ কোন মনুষ্যের কৃতি নয়।

(২) বেদজ্ঞান সৃষ্টির আরম্ভে পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রের জন্য দিয়েছেন— **"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ** (যজু. ২৬।২) দেশ, রাষ্ট্র, স্ত্রী, পুরুষের কোন বন্ধন নাই।

(৩) যেহেতু বেদ সৃষ্টির আরম্ভে হয়েছে ; অতএব এতে কোনো ঋষি, মুনি, রাজা, রানী বা দেশের অনিত্য ইতিহাস হতে পারে না।

(৪) বেদ হল সংসারের মনুষ্যদের জন্য অতঃ ব্রাহ্মণ বা কোনো অন্যবর্গ বা দেশ বা রাষ্ট্রের তার উপর একাধিকার নেই। বেদ মনুষ্যমাত্রেরই জন্য, যে পড়তে পারে সে পড়ে, যে আচরণ করতে পারবে সে করবে, পরমেশ্বর কোনো বর্গ বা দেশের সাথে ভেদভাব করে না। না কোন দেশ, নারী, পাহাড় বা ভূগোলের বর্ণনা ঈশ্বরীয় পুস্তকে হবে।

(৫) পরমেশ্বর বেদজ্ঞান দিয়েছেন, পরমেশ্বর প্রকৃতির এবং সংসারের নিয়ম তৈরি করেছেন। অতঃ বেদ প্রতিপাদিত সৃষ্টিবিদ্যা এবং আমাদের সম্মুখে বর্তমান সৃষ্টিতে সমন্বয় রয়েছে। 'বেদান্ত চতুঃসূত্রী'তে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে—

(১) **অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা** ঃ— ঋষি ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন, কেননা—

(২) **জন্মাদ্যস্য যতঃ** ঃ— এই সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় তিনিই করেন, এবং

(৩) **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ** ঃ— শাস্ত্রসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় তিনিই করেন, এবং

(৪) **তত্তুসমন্বয়াৎ** ঃ— পরমেশ্বরের শ্রব্যকাব্য বেদ এবং দৃশ্যকাব্য হল সৃষ্টিতে সমন্বয়।

অতঃ প্রমাণিত হয় যে পরমেশ্বরই বেদ তৈরি করেছেন এবং সেই পরমেশ্বরই সৃষ্টিরও নির্মাণ করেছেন। এইজন্যই সৃষ্টি (যা পরমেশ্বরের কার্য্য) এবং বেদ (যা পরমেশ্বরের জ্ঞানে) সমন্বয় রয়েছে। না তো সৃষ্টিতে বেদজ্ঞানের বিরুদ্ধ কিছু আছে এবং না বেদে সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ কিছু আছে। অতঃ বেদ হল সৃষ্টি-নির্মাতা প্রভু পরমেশ্বরের জ্ঞান॥

পরিশিষ্ট-APPENDIX-অনুপূরক

মহর্ষি দয়ানন্দ এবং বেদ—ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

মহর্ষি দয়ানন্দ বেদকে তাঁর নিজের দৃঢ় আধার-শিলারূপে হৃদয়স্থ করেছেন। তিনি বেদকে নিজের জীবনের মার্গদর্শক, নিজের আন্তরিক সত্তার নিয়ম এবং নিজের বাহ্য কার্য্যের প্রেরণা-প্রদাতা মানতেন। এটিই নয়, তিনি একে শাশ্বত সত্যের বাণী বলে মানতেন যাকে মনুষ্যমাত্র নিজের ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানের জন্য তথা ভগবান এবং মানবসাথীদের প্রতি নিজের সম্বন্ধগুলির জন্য উচিৎ এবং দৃঢ় আধার তৈরি করতে পারে। পরন্তু অন্য দিকে বহু লোক বলে থাকেন যে বেদের এমন কোনো নিত্য পাহাড়-পর্বতের অস্তিত্বই নাই, ওখানেও সব জায়গায় প্রাপ্ত্য মাটি এবং বালি ছাড়া আর কিছুই নাই। বেদে পুরাতন কালের ভেড়া চড়ানো সংগীতের অতিরিক্ত আর আছেই বা কি? তা কেবল হল প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের মর্যাদাহীন পূজা যা তাঁকে পুরুষাকার কল্পিত করে করা হয়েছে। অপিতু এর থেকেও নিম্নস্তরের কথা এটুকু বলা যেতে পারে যে এতে কর্মকাণ্ডে প্রযুক্ত হওয়া অর্দ্ধ-ধার্মিক, অর্দ্ধ-জাদুভরা স্তোত্র রয়েছে যাকে পড়ে আদিকালের অন্ধশ্রদ্ধালু পশুপ্রায় মানব আশা করতো যে, আমরা সোনা, অন্ন এবং পশু পাব আমরা আমাদের শত্রুদের নির্দয়তাপূর্বক নাশ করতে পারবো। নিজেদেরকে রোগ, অনর্থ এবং রাক্ষসী প্রভাব থেকে বাঁচাতে পারবো এবং এইভাবে ইহলৌকিক স্বর্গের স্থূল আনন্দ ভোগ করতে পারবো। এই দুইটি বিচারের সাথে আমাদের আর একটি তৃতীয় বিচার যুক্ত করতে হবে। সেটি হল কট্টর-পন্থী বিচার বা কমপক্ষে সেই বিচার যা সায়ণের ভাষ্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই বিচার বস্তুতঃ বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের নিম্নশ্রেণীর ব্যাখ্যা স্বীকার করে এবং তা সত্ত্বেও বিচারসমূহের এই আদিকালীন খিচুড়িকে পাবন ধর্মশাস্ত্র এবং পবিত্র কর্ম বা যজ্ঞ-গ্রন্থের রূপে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানে। তাহলে কি এটাকে এই নিম্নশ্রেণীর ব্যাখ্যার কারণেই উৎকৃষ্ট মনে করে?

সুতরাং এই বিষয়টি পূর্ণতাজা বিদ্বত্তাসম্বন্ধী প্রশ্ন নয়, পরন্তু অনেক দৃষ্টি থেকে এর জীবন্ত মহত্ত্ব রয়েছে কেবল এইজন্য নয় যে, এঁর দ্বারা মহর্ষি দয়ানন্দের কার্য্যের ঠিক-ঠিক অনুমান লাগানো যাবে না বরং এইজন্যও যে

এ থেকে আমরা আমাদের অতীতের বিষয়ে জানতে পারবো এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে নির্ধারিত করা প্রভাবগুলির নির্ধারণ করতে পারবো। কোনো রাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে যে রূপ ধারণ করতে হয় তাতে যখন সে নিজেকে বিকশিত করে তখন যা কিছু সে অতীতে ছিল এবং বর্তমানে রয়েছে, তার বলেই সে এই কার্য্য করে। তার এই বিকাশে সচেতন এবং অবচেতনরূপে অন্বেষণ করার এমন সময় আসে যখন তাঁর রাষ্ট্রীয় আত্মা সেই সব জিনিষের মধ্য থেকে পছন্দ করে যা সে অতীতকালে পেয়েছিল অথবা বর্তমানকালে পাচ্ছে, তখন সে তাতে গোলমাল করে এবং পুনরায় এই দৃষ্টি থেকে কী নিজেদের ভবিষ্যতের বিকাশ এবং কর্মের জন্য তাকে সামগ্রী এবং পুঁজি রূপে কি কি বস্তুর দরকার হবে, সে কিছু ছেড়ে দেয় এবং কিছু নিয়ে নেয়। এই ধরনের অন্বেষণের সময় থেকে আমরা বর্তমানেও চলেছি এবং মহর্ষি দয়ানন্দ এই প্রকারের সময়ের মহান এবং বিধায়ক আত্মাসমূহের মধ্যে ছিলেন। পরন্তু আমাদের অতীতকালের সমস্ত সম্পদার মধ্যে বেদ সব থেকে অধিক পূজাস্পদ এবং প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষরূপে সবথেকে অধিক শক্তিশালীও রয়েছিল। যখন বেদের অভিপ্রায় বুঝতে পারাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যখন বৈদিক পরম্পরাগুলি পৌরাণিক রংগ-রূপের আড়ালে লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, সেই সময়েও বেদ বুঝতে পারা না গেলেও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা যেত, প্রামাণিক দৈবী প্রেরণা এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞান রূপে তথা সমস্ত আদেশের মূলস্রোত এবং সমস্ত সত্যের মানদণ্ড হিসাবে সম্মানিত করা হত।

পরন্তু বেদের বিষয়ে শুরু থেকেই এই দুইটি পরস্পর অসঙ্গত পরম্পরা থেকে গিয়েছিল—একটি হল যে বেদ কর্মকাণ্ডীয় এবং গাথাত্মক গ্রন্থ এবং দ্বিতীয়টি বেদ হল দিব্যজ্ঞানের গ্রন্থ। ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ প্রথম পরম্পরাকে মেনেছে এবং ধারণ করেছে তথা উপনিষদসমূহ দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করেছে। তৎপশ্চাৎ পণ্ডিতেরা বেদকে মুখ্যতঃ কর্মকাণ্ডের তথা সাংসারিক কার্য্যের পুস্তকরূপে মেনেছে এবং বিশুদ্ধজ্ঞানের প্রাপ্তির জন্য তাঁরা অন্যত্র আশ্রয় খুঁজতে শুরু করেছে। পরন্তু জাতি তার নিজের সহজ প্রেরণাবশ[০] বেদের আগে নতমস্তক হয়েছে, সে বেদের উচ্চতর পরম্পরার অস্পষ্ট স্মৃতিকে নিজের ভেতরে অদম্য রূপে ধরে রেখেছে। আজ যখন আমাদের যুগে বেদের উপর থেকে শ্রদ্ধাপূর্ণ উপেক্ষার পর্দাকে সরিয়ে তাকে কুয়াশাচ্ছাদিত সুরক্ষিত স্থান থেকে বাইরে বের করা হয়েছে, তাহলেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলছে। আজ একদিকে পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা সায়ণের নির্দেশগুলিকে

বিস্তার করে বেদকে প্রাকৃতিক দেবতাদের জন্য গাওয়া কর্মকান্ডপরক স্তোত্রের গ্রন্থসমূহের শ্রেণীতে চিরকালের জন্য রেখে দিয়েছে—এরকম দেখা যাচ্ছে। **অন্যদিকে জাতির প্রতিভা দয়ানন্দের চক্ষু দিয়ে দেখে দেখে অনেক শতাব্দী থেকে চলে আসা ভুলকে শরণ করে পুনঃ সাক্ষাৎ করে নিয়েছে যে বেদ হল অনাদি দৈবী প্রকাশের অন্তঃপ্রেরিত জ্ঞান এবং মানবতাকে প্রদান করা দিব্য সত্য।** যা কিছুই হোক না কেন, বর্তমানে আমাদের বেদের বিষয়ে উক্ত দুটি বিচারের মধ্যে যে কোনো একটিকে পছন্দ করে নিতে হবে। এখন আমরা বেদকে অজ্ঞানপূর্ণ শ্রদ্ধার গভীর তলে চেপে রেখে বা ধার্মিক আত্ম-বঞ্চনার দ্বারা সংশোধিত করে অত্যন্ত পবিত্র বস্তুর মতো আরও বেশী সুরক্ষিত রাখতে পারবো না। হয়তো বেদের স্বরূপ সেটা যাকে সায়ণ আমাদের সামনে রেখেছেন এবং তখন আমাদেরকে এই ধরনের গাথাশাস্ত্র এবং কর্মকান্ডের লেখা হিসাবে বেদকে চিরকালের জন্য পিছনে রেখে দিতে হবে যাতে বর্তমান বিচারশীল মনীষীদের জন্য কোনো কিছুই জীবিত সত্য বা বল না থাকে। অথবা বেদের স্বরূপ সেটি যাকে পাশ্চাত্য বিদ্বান আমাদের সামনে রেখেছেন এবং তখন আমাদের অর্দ্ধ-অসভ্য জাতির পূজার পুরাতন রেকর্ড রূপে বেদকে অতীতের অবশেষে এককোণে রেখে দিতে হবে, অথবা **আধার বেদ হল সত্যিকার বেদ, দিব্যজ্ঞানের গ্রন্থ এবং তখন আমাদের জন্য এটি সর্বোপরি মহত্ত্বের বস্তু হয়ে যায় যে আমরা বেদকে যেন জানি এবং তার সদুপদেশ যেন শুনি।** এই আপত্তি উঠানো হয় যে বেদের দয়ানন্দকৃত অর্থ সত্য অর্থ নয় বরং কল্পনাকুশল পান্ডিত্য এবং চাতুর্য্যের মনঃকল্পিত কৃত্রিম রচনা। তাঁর শৈলীর উপর এই দোষ লাগানো হয় যে তা স্বচ্ছন্দ এবং বাঁকা তথা সমালোচনাত্মক তর্ক দিয়ে স্বীকার করা যেতে পারে না। উনি যে বেদকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলেছেন তার উপর এটা বলা হয় যে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের বিচারটাই হল সেই অন্ধবিশ্বাস যাকে বিশ্ব ত্যাগ করে দিয়েছে এবং যাকে আজ স্বীকৃতি দেওয়া অথবা সত্যের সাথে ঘোষণা করা যে কোনও জ্ঞানবান পুরুষের কাছে অসম্ভব। মহর্ষি দয়ানন্দ বেদমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা কতটা শক্তিশালী তার পরীক্ষা এখানে আমি করব না, তাঁর বেদভাষ্যের উপর ভবিষ্যতে কি মতামত রাখা যাবে তার ভবিষ্যৎ বাণীও করব না এবং না তাঁর ঈশ্বরীয় জ্ঞান (ইলহাম)-র সিদ্ধান্তের উপর বিবাদ প্রস্তুত করব। আমি এখানে কেবল তাঁর বেদবিষয়ক বিচারের আধারভূত মুখ্য সিদ্ধান্তের বর্ণনা করব যেভাবে তিনি আমার সামনে উপস্থিত হন।

কারণ, আমার দৃষ্টিতে কোনো মহান আত্মা বা মহান ব্যক্তির কর্ম এবং বিচারে মুখ্য প্রাণভূত বস্তু এটা হয় না যে তিনি তাকে কি রূপ প্রদান করেছেন কিন্তু হতে পারে যে আমাদের মানবীয় উপলব্ধি এবং দিব্য সম্ভাব্যতার অদ্যাবধি অতি স্বল্প ভাণ্ডারের তিনি নিজের কর্মের দ্বারা কতটা সহায়ক সত্য আরও জুড়েছেন অথবা এরকমও বলতে পারেন যে তাকে পুনঃপ্রাপ্ত করে দিয়েছেন।

মহর্ষি দয়ানন্দের আলোচকেরা যাঁরা তাঁর কার্য্যের যে নিরাদর করেছেন, তাকে প্রথমে যদি নেওয়া হয় তো, তারা কে, এটা আক্ষেপ করা কিছুটা শোভা দিতে পারে যে মহর্ষি বেদের অর্থ নিজের কপোলকল্পিত এবং ইচ্ছা খুশী চতুরতার সাথে করেছেন। তাঁদের মুখকে তো এটা শোভা দিতে পারে না যাঁরা সায়ণের পরম্পরাগত ভাষ্যকে স্বীকার করেন। কেননা, যদি স্বচ্ছন্দ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ চালাকির কখনও কোনো স্মৃতি-চিহ্ন থেকেছে তো সেটা নিঃসন্দেহ এই ভাষ্যই যাতে মহান পাণ্ডিত্য, ন্যায়-নির্ণয়, সুনিশ্চিত রুচি এবং নির্দোষ আলোচনাত্মক এবং তুলনাত্মক নিরীক্ষণকে বিসর্জন দিয়ে রেখেছে, প্রত্যক্ষ অবলোকন এবং এই পর্যন্ত কি অত্যন্ত সহজ সরল সাধারণ ধারণাকেও এক পাশে ফেলে রেখেছে, যেটি প্রায় মহান পাণ্ডিত্য করে থাকে। এতে পূর্ব নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত থেকে জোরপূর্বক সমতা স্থাপিত করার জন্য মূলগ্রন্থকে একটানা বিকৃত করা হয়েছে। এমনিতে আচার্য্য সায়ণের দ্বারা আমাদের প্রদত্ত এই ভাষ্য দ্বিতীয়টির মতো অনেকটা প্রভাবশালী, প্রারম্ভিক সাধনরূপে বহু উপযোগী, অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অতীব শ্রমসাধ্য। না এই ধরনের দোষারোপণ সেইসব লোকের শোভা দেয় যাঁরা ইউরোপীয় বিদ্বানদের সম্প্রতি কৃত-প্রযত্নকে বেদের বিষয়ে অন্তিম পরিণাম ভেবে থাকেন, কেননা যদি কখনও বৈদিক ব্যাখ্যার কোনো এই ধরনের প্রযত্ন করা যায় যাতে চাতুর্য্যপূর্ণ কল্পনার জন্য অধিকাধিক খোলা লাগাম ছেড়ে দেওয়া যায়, যাতে সন্দেহাস্পদ নির্দেশগুলিকে নিশ্চিত প্রমাণরূপে শীঘ্রতার সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া হয়, যাতে তুচ্ছতম প্রমাণের উপর অতি সাহসপূর্ণ পরিণাম বড় আগ্রহপূর্বক বের করে নেওয়া হয়, অতি মহান কাঠিন্যগুলিকেও উপেক্ষা করে দেওয়া হয় এবং মূলগ্রন্থকে স্পষ্ট তথা প্রায়ঃ সর্বস্বীকৃত নির্দেশসমূহের বিরোধেও নিজের পূর্ব নির্দ্ধারিত, পক্ষপাতপূর্ণ ধারণারই পোষণ করা হয় তো সেটি হল নিঃসন্দেহ এই প্রযত্ন-ই। এমনিতে পূর্ণ শতাব্দীর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় বৈদিক বিদ্বানদের দ্বারা বেদের উপর যে প্রযত্ন করা

হয়েছে এক প্রকারে নিজের উদ্যোগ, সদিচ্ছা এবং অনুসন্ধান-শক্তির দৃষ্টিতে অনেকখানিই সম্মানীয়।

এই বিষয়ের উপর মুখ্য ভাবাত্মক প্রশ্নটি কি যার উপর আমাদের বিচার করতে হবে? বেদের কোনো ব্যাখ্যার সফলতা বা বিফলতা একথার উপর নির্ভর করে যে তাতে বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রীয় বিচার কি মানা হয়েছে এবং স্বয়ং বেদের নিজস্ব অন্তঃসাক্ষী সেই বিচারকে কোথা থেকে পুষ্ট করে। এই বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দের দৃষ্টিকোণ একদম স্পষ্ট এবং তাঁর আধার হল অখন্ডনীয়। বেদের সূক্তগুলিতে অনেক নামের দ্বারা একই পরমদেবতার গীত গাওয়া হয়েছে সেই সব নাম তাঁর গুণ এবং শক্তিকে প্রকট করার জন্য করা হয়েছে এবং এ পর্য্যন্ত কি এই অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে রচনা করা হয়েছে। মহর্ষির এই বিচার কি মনঃপুত ছিল যা তাঁর নিজেরই অতি চাতুর্য্যপূর্ণ কল্পনার দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে? কখনও না, এটা তো স্বয়ং বেদেরই সুস্পষ্ট বচন হল—"একই সৎ-র বিষয়ে বিপ্রলোক অনেক প্রকারে বর্ণন করেন, ইন্দ্রের রূপে, যম, মাতরিশ্বা এবং অগ্নির রূপে।" এটি মনে রাখা যোগ্য যে বর্ণনা করা লোক অজ্ঞানী নয় বরং বিপ্র, ঋষি, জ্ঞানধনী দ্রষ্টা। বেদের ঋষিলোক তাঁদের ধর্মের বিষয়ে অবশ্য কিছু জেনে থাকবেন, আমাদের আশা করা উচিৎ যে রাথ বা মোক্ষমূলর থেকে অনেক বেশী জেনে থাকবেন এবং যা তাঁরা জানতেন তা এইটাই।

আমরা জানি যে আধুনিক বিদ্বান এই প্রমাণ থেকে বাঁচার জন্য কিরকম ভেঙেচুরে বিকৃত করেন। তাঁরা বলেন যে উপরে উদ্ধৃত বেদমন্ত্র হল পরের রচনা। এটি এত উচ্চ বিচার, যা এতখানি স্পষ্টতা এবং প্রবলতার সাথে প্রকট করা হয়েছে, আর্য্যদের মনে কোনো প্রকারে পরে উদয় হয়েছে অথবা এইসব অজ্ঞানী অগ্নিপূজক, সূর্য্যপূজক, নভপূজক আর্য্যদের নিজেদের মনে স্বয়ং উঠেও নি, কিন্তু তাঁরা একে নিজেদের সুসংস্কৃত তথা দার্শনিক দ্রাবিড় শত্রুদের কাছ থেকে ধার নিয়েছে। পরন্তু সবই বেদে আমাদেরকে এই বিচারের পুষ্টি করা মন্ত্র এবং বচন প্রাপ্ত হয়। অগ্নি বা ইন্দ্র বা অন্য সব দেবতাদের সাথে হল এক। অগ্নিতে অন্য সব দেবতাদের শক্তি রয়েছে, মরুৎকে সর্বদেবতাময় বর্ণনা করা হয়েছে, এক দেবতা যেখানে নিজের নামের দ্বারা সম্বোধিত করা হয়েছে সেখানে অন্য দেবের নামের দ্বারাও বা যেমন প্রায়ই দেখা যায়, এক-এক দেবতাকে জগতের পতি বা বিশ্বের রাজা মেনে তাঁর জন্য এই ধরণের বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে যা একমেব পরম দেবের

জন্যই প্রয়োগ হতে পারে। পরন্তু পশ্চিমী বিদ্বান্ বলবেন—আহা! এর এই অর্থ হতে পারে না, হওয়া উচিৎ নয় এবং কখনই হতে পারে না। যে বেদে এক ঈশ্বরের পূজার প্রতিপাদন রয়েছে, এর জন্য আমাদের একটি নূতন শব্দের আবিষ্কার করে একে হিনোথীজম (Henotheism-ঐকৈক অধিদেববাদ) নাম দেওয়া উচিৎ এবং মেনে নেওয়া উচিৎ কি ঋষি অগ্নি বা ইন্দ্রকে বাস্তবে এক পরম দেবতা মানতেন না কিন্তু যে কোনও বা প্রত্যেক দেবতার সাথে সেই-সেই সময়ের জন্য পরম দেবের মতো ব্যবহার করতেন, সম্ভবতঃ এই জন্য যে তাঁরা মনে করতেন যে, এইভাবে সেই দেব তাঁর অধিক চাটুকারিতায় প্রসন্ন হয়ে, এতবেশী বৃহৎ স্তুতি শুনে বিগলিত হয়ে যায়। পরন্তু কেননা স্বাভাবিক একেশ্বরবাদকেই বৈদিক বিচারের আধার মেনে নেওয়া যায়, এই নূতন বের করা ভয়ংকর হিনোথীজম-র দরকারই কি রয়েছে? এইজন্য কি আদিম অসভ্য লোক এই ধরনের উচ্চ বিচার পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারতো না এবং যদি তাঁদের সেখানে পর্যন্ত 'পৌঁছে যাওয়া' মেনে নেওয়া যায় তাহলে আমাদের বিকাশবাদের দ্বারা অনুমিত মানবীয় উন্নতির ক্রমিক অবস্থার সিদ্ধান্তের উপর জল ঢেলে দেওয়া হয় এবং বেদমন্ত্রের আশয় সম্বন্ধে তথা মনুষ্যজাতির ইতিহাসে বেদের যে স্থান রয়েছে তার সম্বন্ধে আমরা যে বিচার তৈরি করে রেখেছি তা সবই ধসে পড়ে যায়। সত্যের উচিৎ কি সে নিজেকে লুকিয়ে রাখুক, সাধারণ বুদ্ধিরও উচিৎ যে সে মাঝখানে বাধা না হয়ে এক তরফ হয়ে যাক যাতে তাঁর একবাদ (থিওরি) ফলে ফুলে সুশোভিত হতে পারে। এইটাই উদ্দেশ্য হল না? আমি এখানে জিজ্ঞাসা করি, বিশেষ করে এই বিষয়ের উপর—এই আধারভূত বিষয়ের উপর জিজ্ঞাসা করছি যে, কে এখানে মূল বেদের সাথে বিনা ক্ষত-বিক্ষত করে সোজা এবং শুদ্ধরূপে ব্যবহার করছে—মহর্ষি দয়ানন্দ অথবা ইউরোপীয় বিদ্বান্?

কিন্তু যদি মহর্ষি দয়ানন্দের এই আধারভূত বিষয় স্বীকার করে নেওয়া যায় এবং স্বয়ং বৈদিকঋষি তাঁর দেবতাগণকে যে স্বরূপ প্রদান করেছেন তা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে আমরা এই কথার জন্য বাধিত হয়ে যাই যে যদি কখনও আমরা ঋচায়েত অগ্নি বা অন্য কোন দেবের বর্ণনা পাই তখন আমরা যেন দেখি যে সেই নামের পেছনে সর্বদা ঋষিদের বিচারে এক পরমদেবতা উপস্থিত আছেন বা সেই পরম দেবতার এক শক্তি তার সহচারীগুণ বা ক্রিয়াসমূহের সাথে বিদ্যমান রয়েছে। তাহলে তৎক্ষণাৎ-ই বেদের সারা স্বরূপ মহর্ষি দ্বারা নির্ধারিত বেদার্থের অনুসারেই সুনিশ্চিত

হয়ে যায়, সায়ণের কেবল কর্মকাণ্ডপরক, গাথাবাদী এবং বহুদেবতাত্মক ইউরোপীয় ব্যাখ্যাও ধরাশায়ী হয়ে যায়। তাঁর জায়গায় আমরা পাই যথার্থ ঈশ্বরীয় শাস্ত্র যা হল বিশ্বের পবিত্রতম গ্রন্থগুলির মধ্যে এবং এক উদাত্ত তথা মহিমাশালী ধর্মের দিব্য বাণী।

বেদের বিষয়ে মহর্ষির যে সব মন্তব্য এই আধারভূত বিচারের তর্ক সম্মত পরিণাম। যদি দেবতাদের নাম এক পরমদেবের গুণসমূহকে বলে দেওয়ার হয় এবং ঋষিগণ এই গুণেরই উপসনা করতেন এবং এরই দিকে তাঁরা তাঁদের অভীপ্সা প্রেরিত করতেন তাহলে অবশ্যই বেদে দৈবী প্রকৃতির অধ্যাত্মবিদ্যার তথা পরমেশ্বরের সাথে মনুষ্য সম্বন্ধীয় বিদ্যার অনেক বড় ভাগ হওয়া উচিৎ এবং মনুষ্যের ভগবন্মুখী প্রবৃত্তির নিয়ামক বিধানের সতত নির্দেশও হওয়া উচিৎ। মহর্ষি দয়ানন্দ বলপূর্বক বলেছেন যে এমন ধরণের নৈতিকতত্ত্ব বেদে বিদ্যমান রয়েছে, তিনি বেদে জীবনের সেই নিয়ম পাচ্ছেন যা পরমেশ্বর মানব প্রাণীকে প্রদান করেছেন। যদি বৈদিক দেবতা সেই পরমদেবের শক্তিকে প্রকট করেছেন যিনি হলেন বিশ্বের রচয়িতা, শাসক এবং পিতা তাহলে বেদে বিশ্ববিজ্ঞানের একটি বৃহৎ ভাগ তথা সৃষ্টি এবং বিশ্বের নিয়মের বর্ণনা অনিবার্যরূপে হওয়াই উচিৎ। মহর্ষি দয়ানন্দ প্রবল শব্দে বলছেন যে এইরকম বিশ্বসম্বন্ধী তত্ত্ব বেদে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বেদের সৃষ্টি রচনার রহস্য তথা প্রকৃতির সেই বিধান পাচ্ছেন যার দ্বারা সর্বজ্ঞ দেব জগতের উপর শাসন করছেন।

পাশ্চাত্য বিদ্বান না তো বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মহত্ত্বকে বিলুপ্ত করতে সফল হতে পেরেছেন এবং না তো কর্মকাণ্ডীয় পণ্ডিত। পরন্তু তাঁরা দুজনেই স্ব-স্ব কারণে একে ভিন্ন-ভিন্ন অংশ থেকে কম করার জন্য লেগেই ছিলেন। পশ্চিমী বিদ্বান একে এইজন্য কম করেন যে, যখন কখনও তাঁরা এই প্রারম্ভিক কালের বচনে এইপ্রকার বিচার বলপূর্বক সামনে আসতে থাকে যা আদিম হতে পারেন, তাহলে তাঁরা অশান্তি অনুভব করেন, তখন তাঁরা নিজেদের সেই ব্যাখ্যাগুলিকেও অমুক স্থলের উপর খোলারূপে ছেড়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না যাকে তাঁরা অন্য জায়গার উপর নিজে প্রয়োগে নেন এবং নিজেরই শব্দশাস্ত্রীয় তথা সমালোচনাত্মক তর্কের বলে নিশ্চিতরূপে আবশ্যক মানেন। কারণ, যদি তাঁরা তাঁকে প্রত্যেক জায়গায় প্রয়োগ নেন তাহলে তাঁদের থেকে প্রায়ঃ বেদে এই ধরনের গম্ভীর তথা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিচারের অস্তিত্ত্ব সিদ্ধ হয়ে যায় যেটা, তাঁদের সম্মতিতে, সেই আদিকালীন

বৈদিক বিচারকদের মধ্যে উৎপন্নই হতে পারতো না। সায়ণ বেদের এই আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মহত্ত্বকে এইজন্য কম করেছেন যে তাঁর মতানুসারে বেদ এই ধরণের নৈতিক ধর্মাচরণ শেখায় না যার ফল নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক হয় অপিতু এ যন্ত্রবৎ যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপ করার শিক্ষা দেয় যার ফল ভৌতিক হয়। পরন্তু বেদের এই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মহত্ত্বকে চেপে রাখার নানারকম প্রযত্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উদাত্ত বিচার, তাঁর উপর যথেচ্ছ প্রকৃতিবাদ বা নির্জীব কর্মকাণ্ডের যে অর্থ আরোপিত করা হয় তার আশ্চর্য্যজনক বিরোধ করে স্বয়ং নিজেকে আজ পর্য্যন্তও প্রকট করে চলে আসছে। ঋচায় সতত বৈদিক দেবতাদের এমন ধরনের বর্ণনা আসে যে এ হল জ্ঞান, শক্তি এবং পবিত্রতার প্রভু, পবিত্রকারক, দুঃখ এবং দুর্গুণের নিবারক, পাপ এবং মিথ্যার বিধ্বংসক তথা সত্যের যোদ্ধা। ঋষি সবসময় তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন যে আমাদের দুঃখ দূর কর, আমাদের পবিত্র কর, আমাদেরকে জ্ঞানের দ্রষ্টা এবং সত্যের স্বামী কর, আমাদেরকে দিব্য নিয়মে ধারণ করে রাখ, আমাদেরকে নিজের বল, পৌরুষ এবং শক্তি দ্বারা সহায়তা প্রদান কর এবং তার সাথে সংযুক্ত কর। বেদে এই ঈশ্বরীয় সত্য এবং ধর্মের বিচারকে মহর্ষি দয়ানন্দ কোথাও বাইরে থেকে নিয়ে আসেন নি। বেদ হল ইহুদীদের বাইবেল তথা পারসীদের অবস্তার সমতুল্য বা তার থেকেও অনেক বেশী ঈশ্বরীয় বিধানের গ্রন্থ।

বেদে বিশ্বসম্বন্ধী তত্ত্বও কোনোরকমেই কম সুস্পষ্ট নয়। ঋষিগণ বারবার বলেন যে অনেক লোক আছে এবং তাদের অটল নিয়ম আছে যার দ্বারা সেগুলি শাসিত হয়, বিশ্বে দেবতাদের ক্রিয়া-প্রণালী কার্য্য করে চলেছে। পরন্তু মহর্ষি দয়ানন্দ এর থেকেও আগে অগ্রসর হয়েছেন, তিনি বলেছেন যে আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানের সত্যটা বৈদিক মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রাপ্য। এখানে আমাদের সামনে তা একমাত্র বিচারণীয় মূল সিদ্ধান্ত প্রস্তুত যার বিষয়ে কারও সন্দেহ করা উচিৎ হতে পারে। এখানে আমি নিজের অক্ষমতা স্বীকার করছি যে এই বিষয়ে আমি নিজের কোনো নিশ্চিত সম্মতি প্রস্তুত করতে পারছি না। কিন্তু এইটুকু বলা আবশ্যক যে প্রাচীন জগতের বিষয়ে আজকালের জ্ঞানের প্রগতি মহর্ষির বিচারকে উত্তরোত্তর পুষ্ট-ই করে চলছে। পুরাতন সভ্যতাগুলিতে অবশ্য অনেক বৈজ্ঞানিক রহস্য ছিল যার মধ্যে থেকে একটিকে আধুনিক বিদ্যা পুনঃপ্রাপ্ত করেছে তথা বিস্তৃত এবং অধিক সমৃদ্ধ করে সমভাবে ব্যক্ত করেছে। কিন্তু অন্য রহস্যগুলিকে আজ

পর্য্যন্তও ব্যক্ত করতে পারেনি। এইভাবে মহর্ষি দয়ানন্দের এই বিচারে একটুও যথেচ্ছ কাল্পনিকতা নাই যে বেদে ধার্মিক সত্যের সমানই বৈজ্ঞানিক সত্যও নিহিত আছে। এর সাথেই আমি এও বলছি যে আমার বিশ্বাস অনুসারে বেদে এক দিব্য বিজ্ঞানের অন্য সত্যও আছে যা বর্তমান জগতের কাছে একদমই নাই। এই অবস্থায় মহর্ষি বৈদিক বিদ্যার গম্ভীরতা এবং বিশালতার বিষয়ে অত্যুক্তি নয় অপিতু ন্যূনোক্তি-ই করেছেন।

ভাষাবিজ্ঞান তথা ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের যে পদ্ধতিতে তিনি নিজস্ব পরিণামে পৌঁছেছেন তার উপরেও আপত্তি উঠানো হয়েছে, বিশেষ করে তখন যখন তিনি দেবতাদের নামের সাথে ব্যবহার করেন। পরন্তু আমি নিশ্চিতরূপে অনুভব করি যে এই আপত্তি উঠানো আমাদের ভুল। সেই ভুলের কারণ এই যে আমরা এই প্রাচীন ভাষার অনুশীলনেও ভাষা সম্বন্ধী আধুনিক বিচারকে সামিল করছি। আমরা আধুনিক লোক শব্দের প্রয়োগ চালু পয়সার মতো ব্যবহার করে থাকি যাতে তার মূলভূত অর্থের কোনো ভাবেই স্মরণ বা মূল্যাংঙ্কণ করা হয় না। যখন আমরা কথা বলি তখন আমাদের ধ্যানে কথিত পদার্থই জুড়ে থাকে, তার ব্যঞ্জক শব্দ একেবারেই থাকে না, শব্দ তো আমাদের কাছে নির্জীব এবং নিস্তেজ বস্তু, ভাষার ব্যবহারিক পয়সা সমূহের মধ্যে একটি পয়সা মাত্র যার নিজের কোনো মূল্য নেই। এর বিপরীত, প্রাচীন ভাষাতে শব্দ অর্থের বোধ করানোর মূলভূত শক্তির সাথে যুক্ত এক সজীব সজাগ বস্তু ছিল। তার মূল অর্থ মনে রাখা হয় কেননা তার প্রয়োগ সেই সময় পর্য্যন্তই হত, তার ওজস্বীতার বৈভব বক্তার মনের ভিতরে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান থাকত। আজ আমরা বলি 'ভেড়িয়া' (হিংস্রক পশু) এবং তার থেকে আমাদের কাছে এক বিশেষ পশু উদ্ভাসিত হয়, অন্য কোনো ধ্বনি থেকেও আমাদের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে যদি সেই ধ্বনির প্রয়োগ সেই অর্থে প্রচলিত হয়। প্রাচীন লোক এর জন্য বলতো 'বৃক' (চিরে দেওয়া পশু) এবং তখন বৃক শব্দের সেই আশয় তাঁর মনে বিদ্যমান থাকত। আমরা বলি 'অগ্নি' তখন আমরা আগুনের ধারণা করে নিই, এ শব্দ আমাদের কাছে এর অতিরিক্ত কোনো কাজের নয়। কিন্তু প্রাচীন লোকেদের কাছে 'অগ্নি'র আরও অনেক অর্থ ছিল এবং এই স্থূল-ভৌতিক আগুনের জন্য এই কারণে প্রযুক্ত হত যে, এর মূল (ধাত্বীয়) অর্থের মধ্যে এক বা একাধিক এর উপর প্রয়োগ হত। আমাদের শব্দসমূহের সামর্থ্য সাবধানতাপূর্বক একটি বা দুইটি অর্থ বলা পর্যন্তই সীমিত রাখা হয়েছে কিন্তু প্রাচীন লোকেরা

শব্দের অনেক অর্থ বলতে সমর্থ ছিল। যদি তাঁরা চাইতেন তাহলে তাঁদের জন্য এটা একেবারেই সহজ ছিল যে তাঁরা অগ্নি, বরুণ বা বায়ুর মতো কোনো একটি শব্দকে অনেকের সাথে সম্বন্ধ তথা জটিল বিচারগুলির জন্য একটি ধ্বনি-তালিকার রূপ প্রয়োগ করতে পারে, সেটি একটি সহায়ক পুস্তকের মতো কাজ দিতে পারবে সেসব শব্দের ব্যবহার করে। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে বৈদিক ঋষিরা বেদমন্ত্রে নিজের ভাষার অতিশয় ওজের অবশ্য লাভ উঠিয়েছেন—তাঁরা গো বা চন্দ্র যেমন শব্দকে কিভাবে প্রয়োগ করেন?—এটি ধ্যান দেওয়ার যোগ্য। বৈদিক শব্দের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিরুক্ত-ও সাক্ষী দেয় তথা ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং উপনিষদগুলিতে আমার দেখি যে শব্দসমূহের এই স্বতন্ত্র এবং প্রতীকাত্মক প্রয়োগের স্মৃতি এখনও পর্য্যন্ত রয়েছে।

নিঃসন্দেহ, ইউরোপীয় বিদ্বানদের ভাষার তুলনাত্মক অধ্যায়নের দ্বারা যে লাভ প্রাপ্ত হয়েছে তা মহর্ষি দয়ানন্দকে প্রাপ্ত হয়নি। নূতন ভাষাবিজ্ঞান নিজ কলেবরে ভীষণভাবে দোষপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন নিরুক্তের দোষ পূর্ণ করতে আমাদের সহযোগ প্রদান করে। ভবিষ্যতে বেদের অর্থের উপর প্রকাশ প্রদান করার জন্য আমাদেরকে প্রকাশের এই দুইটি স্রোতকে প্রয়োগ করতে হবে। তাও এর থেকে কেবল বিবরণের বিষয়গুলির উপরই প্রভাব পড়ে, মহর্ষির ব্যাখার আধারভূত সিদ্ধান্ত থেকে অনেক দূরে আছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হল বুদ্ধিতথা পাণ্ডিত্যের কাজ এবং বৌদ্ধিক সম্মতি এবং পাণ্ডিত্যের বিষয়ে লোক সম্ভবতঃ বিবেচনার শেষ পর্য্যন্ত মতভেদ-ই রাখে-দেখা যায়। কিন্তু সমস্ত মৌলিক সিদ্ধান্তগুলিতে, সেই মহান এবং আধারভূত নির্ণয়গুলিতে যেখানে বুদ্ধির ক্রিয়ার জন্য দিব্য অন্তর্জ্ঞানের দৃষ্টির সহায়তা প্রাপ্ত করাটা আবশ্যক হয়, মহর্ষি দয়ানন্দ সর্বদা উচিৎ মনে করেন। স্বয়ং বেদে প্রতিপাদিত তত্ত্বের দ্বারা, তর্ক এবং যুক্তির দ্বারা এবং মানবজাতির অতীতের বিষয়ে আমাদের ক্রম বর্দ্ধিত জ্ঞানের দ্বারাই তিনি নির্ভুল প্রমাণিত হন। বেদ অবশ্য অনেক নাম এবং শক্তিসম্পন্ন এক পরম দেবতার স্তুতি করে, বেদ অবশ্য দিব্য বিধান তথা তাকে পূর্ণ করার মানবী আকাংক্ষার গুণগান করে, নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য হল আমাদের জন্য সৃষ্টির নিয়মের প্রতিপাদন করা।

ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রশ্নের উপর লিখতে আমার কাছে স্থান বেঁচে নাই। এইটুকু বলা পর্যাপ্ত যে—এই বিষয়েও মহর্ষি দয়ানন্দ হলেন পূর্ণরূপে যুক্তি সঙ্গত। উনি যে এই সিদ্ধান্তকে মেনেছেন এবং উদ্‌ঘোষিত করেছেন এই কারণে তাঁর উপর এই দোষ লাগানো উচিৎও সত্য নয়ে। এটা একেবারেই

হাস্যাস্পদ। যদি আমরা সত্তাকে যৎকিঞ্চিত-ও বুঝতে চাই তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এখানে তিনটি আধারভূত তত্ত্ব প্রারম্ভ থেকেই বিদ্যমান রয়েছে এবং পুনঃ আমাদের সে সব পরস্পর সম্বন্ধকে ও জানতে হবে। সেই তত্ত্ব হচ্ছে পরমেশ্বর, প্রকৃতি এবং জীবাত্মা। মহর্ষির কাছে শক্ত আধার হল যে বেদ আমাদেরকে পরমেশ্বরের দর্শন করায়, প্রকৃতির নিয়মের দর্শন করায় এবং প্রকৃতি এবং পরমেশ্বরের সাথে জীবাত্মার সম্বন্ধের দর্শন করায়। যদি এরকম হয় তাহলে এটি দিব্য সত্যের ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অতিরিক্ত আর কি? যেভাবে তিনি মানতেন, বেদ এইসব কথাগুলিকে আমাদের সামনে পূর্ণ সত্যের সাথে, সর্বদা নির্দোষরূপে প্রকাশিত করে। যদি এইরকম হয় তাহলে তিনি বেদকে নিশ্চয়-ই নির্ভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থ মানতে পারেন। বাকি যা থাকে সে তো ঈশ্বরীয় জ্ঞানের বিধির প্রশ্ন, আমাদের জাতির সাথে ঈশ্বরের ব্যবহারের, মনুষ্যের আধ্যাত্মিকতা তথা সামর্থের প্রশ্ন। আধুনিক চিন্তন প্রকৃতি এবং নিয়মকে স্বীকার করে তথা পরমেশ্বরের নিষেধ করে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সম্ভাবনাকেও নিষেধ করে দিয়েছে। পরন্তু এমনিতে তো এ আরও অনেক বিষয়কে অস্বীকার করেছে যাকে অধিক অর্বাচীন বিচারক এখন পুনরায় স্বীকার করতে অত্যধিক তৎপর হয়েছেন। আমরা একজন মহান মনীষীর কাছে এই দাবি করতে পারিনা যে তিনি, যেখান থেকে আনা হয়েছে, কোনো সম্মতির অথবা সেই সময়ের কোনো অস্থায়ী সিদ্ধান্তের দাস হয়ে যান। তাঁর মহত্তার আসল পার এইটি যে সে আগে দেখে, গম্ভীরতার সাথে দেখে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বেদের ব্যাখ্যার বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ তাঁর সত্য সূত্রসমূহের প্রথম আবিষ্কারকরূপে সদা সমাদৃত হয়ে থাকবেন, বেদের অন্তিম সর্বাঙ্গপূর্ণ ব্যাখ্যা যাহা হোক না কেন তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী চক্ষু পুরাতন অজ্ঞান এবং যুগব্যাপী ভ্রান্তির অব্যবস্থা এবং অন্ধরাত্রিকে ভেদ করে সোজা সত্যের শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছেছে এবং মূল তত্ত্বের উপর ছুঁয়ে গিয়েছে। তিনি সেইসব দরজাগুলির চাবি প্রাপ্ত করেছিলেন যাকে কাল (মহাকাল) বন্ধ করে রেখেছিল এবং রুদ্ধ নির্ঝরগুলির অযুঃস্থলের উপর লেগে থাকা মোহরকে ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন।

(বৈদিক ম্যাগাজিন—১৯১৬)